Missing Issues

Sundaram

Yr. 6, No. 3, 1368 B.S.

Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.: CSS 2006/ 2	Place of Publication: Sundaram Prakashani, 54, Ganesh Chandra Avenue, Calcutta-13.
Collection: Indrajit Chaudhury, A.B.P. House, Kolkata.	Publisher: Subho Thakur.
Title: *Sundaram* (Bengali monthly art magazine)	Year of Publication: Year 6, No.4 - 12, 1369 B.S (1962) – Year 7, No. 1, 1369 B.S. (1962).
	Size (l. x b.): 23c.m. x 17c.m.
Editor: Subho Thakur (03. 01. 1912 – 17. 07. 1985).	Condition: Good.
	Remarks: Single volumes with advertisements; Sequence of page numbers may break as cover pages, title pages, content lists are not included in the numbered pages of the book.

Microfilm roll No.: CSS	From gate:	To gate:

সুন্দরম্

চিত্র, কারুকলা, সংগীত, নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্র

সম্পাদক : সুভো ঠাকুর

এই সংখ্যার লেখা ও লেখক

দুটি আলেখ্য
সুভো ঠাকুর উবাচ

পশ্চিম জার্মানীর ভাস্কর্য	দক্ষিণারঞ্জন বসু
গুস্তাভ্ ভিগেলান্ড	চিন্তামনি কর
অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা	দরবেশ
আধুনিক ডাচ ভাস্কর্য	অহিভূষণ দাশগুপ্ত
আইসল্যান্ডের ভাস্কর্য	সুহাস সেন
প্যারিস কি মনে রাখে ?	সলিল ঘোষ
দৃষ্টিকোণ	হেনরী মুর। অ: শংকর দাশগুপ্ত
ভাস্কর্য সম্পর্কে বক্তব্য	জিয়াকোমেত্তি। অ: রাণা বসু
প্রদর্শনী পরিক্রমা	বিশেষ প্রতিনিধি

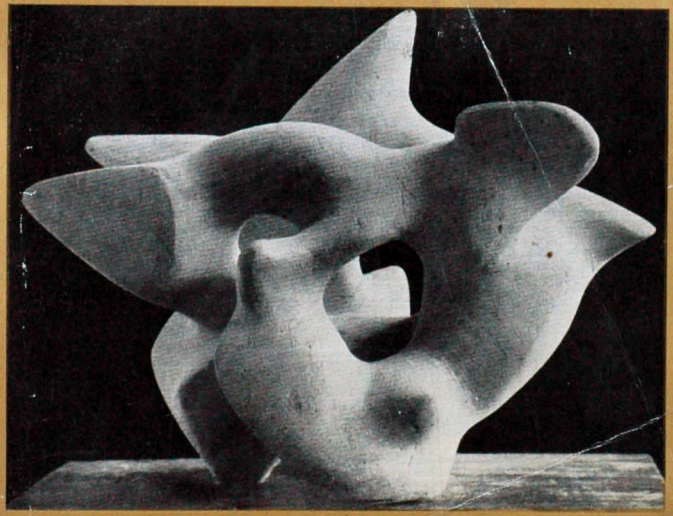

পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত ভাস্কর কার্ল হারতুঙ-কৃত ভাস্কর্য। নাম : বিশেষ ফর্ম

দাম : দুটাকা

সুন্দরম্

চিত্র, কারুকলা, ভাস্কর্য, স্থাপত্য, নৃত্য, নাট্য ও চলচ্চিত্রের সংস্কৃতিমূলক মাসিক পত্রিকা।

আগামী ৮ই আশ্বিন সুন্দরম্-এর সপ্তম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা
অপূর্ব ভারতীয় মূর্তিশিল্পের একটি অ্যালবাম হিসাবে প্রকাশিত হবে।

গত বছরের আশ্বিন থেকে সুন্দরম্ 'বিশ্বের ভাস্কর্য'—এই বিষয় নিয়ে খণ্ডে খণ্ডে একটি ক্ষুদ্রাকার বিশ্বকোষের নাম্ন প্রকাশিত হচ্ছে। য়ুরোপের ভাস্কর্যের নানা দিগন্ত পরিক্রমণ শেষে এই সপ্তম বর্ষের সূচনা হোলো এশিয়ার ভাস্কর্যের প্রথম খণ্ড—ভারতবর্ষের ভাস্কর্য। সংস্কৃতিবান যাঁরা ভারতের গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করেন, তাঁদের কাছে এই খণ্ডটির মূল্য অখণ্ডনীয়।

● **চিত্রশিল্পীদের মধ্যে যেমন শশী হেস, ভাস্করদের মধ্যে তেমনি বাঙালী ভাস্কর ফণী বোস। এঁর নাম আপনি পূর্বে শুনেছিলেন কি?** এঁর কাজের সম্পর্কে কেউ জানেন না বোল্লেই চলে। ইনিই বিদেশে গিয়ে সর্বপ্রথম এ, আর, সি, এ ডিগ্রী অর্জন করেন ভারতে। তাঁর উপর একটি মূল্যবান তথ্য-সমৃদ্ধ আলোচনা পরিবেশিত হবে।

● **একদা খ্যাতির উচ্চ শীর্ষে আরোহণ কোরেছিলেন বাঙালী ভাস্কর প্রমথ মল্লিক।** সাম্প্রতিককালের শিল্পরসিকজন তাঁর নাম বিস্মৃত হোয়েছেন। বেলজিয়ান ভাস্কর ভেনটাপোরলুর সঙ্গেই যেন তাঁর ভাগ্যের তুলনা চলে। বহু কষ্টে তাঁর কাজের কিছু নিদর্শন সংগ্রহ করা সম্ভব হোয়েছে। ভাস্কর প্রমথ মল্লিক সম্পর্কে আলোচনা কোরেছেন রাণা বসু।

● **ভারতীয় ভাস্কর্যের তাৎপর্য : প্রবন্ধটির রচনাকার শ্রীঅরবিন্দ।** বলা বাহুল্য, এই প্রবন্ধটির বিষয় গৌরব অপরীসিম। ভারতীয় সংস্কৃতি ও শিল্পের অন্তর্নিহিত তাৎপর্যের ধ্যান-নিমগ্ন মূর্তি শ্রীঅরবিন্দের মানস নেত্রে উদ্ভাসিত। মূল প্রবন্ধটি বাংলায় অনুবাদ কোরেছেন শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন অধ্যাপক শিশিরকুমার ঘোষ। বর্তমানে ইনি অবস্থান কোরছেন আমেরিকায়।

● **বাংলা তথা ভারতের গৌরব দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। ইদানীংকালের শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের একজন তিনি। ভাস্কর্য সম্পর্কে তাঁর মতামত বিশেষ মূল্যবান।** দ্বিতীয় প্রবন্ধটি রচনা কোরেছেন দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী। তাঁর কাজের নিদর্শন হিসাবে অনেকগুলি ছবি মুদ্রিত করা হোয়েছে।

● **অবনীন্দ্র শিষ্য প্রখ্যাত নামা শিল্পী অসিতকুমার হালদার মহাশয় রচনা কোরেছেন তৃতীয় প্রবন্ধ :** ভাস্কর্য কলার মর্ম কথা। অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের মিনিয়েচার ভাস্কর্যের কয়েকটি নিদর্শন এই প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট করা হোয়েছে।

● **বাংলাদেশের আধুনিক শিল্পেতিহাসে ভাস্কর্যে প্রথম যুগের পথিকৃত ছিলেন হিরণ্ময় রায়চৌধুরী।** তাঁর জীবনী ও কাজের আলোচনা কোরেছেন শংকর দাশগুপ্ত। ভাস্কর হিরণ্ময়ের বিশিষ্ট কাজের নিদর্শনগুলি প্রবন্ধটিকে বিশেষ আকর্ষণীয় কোরেছে—একথা সুনিশ্চিত বলা যায়।

● **সুন্দরম্ পঞ্চাশ-হাজারি থানইণ্টক-মার্কা পত্রিকা নয়।** সুন্দরম্ নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাপা হোয়ে থাকে—কৃষ্টিবানদের জন্য। সেই কারণে অবিলম্বে নাম তালিকাভুক্ত কোরে না রাখলে না-পাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশী।
প্রতি খণ্ড দাম : দু টাকা।

প্রতি খণ্ড এক সঙ্গে পাঁচ কপি নিলে শতকরা ২৫ টাকা কমিশন।
সুন্দরম্ কার্যালয় : **৬-এ সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স, ৭নং চৌরাঙ্গি রোড। কোলকাতা : তেরো।**
টেলিফোন : ২৩-৯৭৭৭
ব্রাঞ্চ অফিস : 'শুভম্'। স্ট্রাণ্ড—দক্ষিণ (পূর্বেকার উডল্যাণ্ডস্ হোটেল)। ফোন : চন্দননগর ৩৬৪

এনামেলের বাসন

- দামে সস্তা
- ভারে লঘু
- ব্যবহারে টেঁকসই
- বিজ্ঞানসম্মত ও স্বাস্থ্যকর

সেরামিক সেলস্ করপোরেশন লিঃ
২৪, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা - ১২

উদ্যমীর উন্নতি ...

১৯২০ সালে, পি, কে, চ্যাটার্জী ইস্কুল থেকে বেরিয়েই শিক্ষানবীস ড্রাফট্‌সম্যান হিসাবে টাটা স্টীলে যোগদান করেন।

তাঁর উন্নতি করবার আর শেখবার অদম্য উৎসাহ ছিল। কাজে ঢুকে তিনি টাটা স্টীলের সবে চালু টেকনিক্যাল স্কুলে যোগদান করেন। কারিগরী শিক্ষার তিন বছরের কোর্স যে সব ছেলে প্রথম পাশ করে তিনি তাঁদের মধ্যে একজন।

চ্যাটার্জী ইঞ্জিনীয়ারিং ডিপার্টমেণ্টে উত্তরোত্তর উন্নতি করেন এবং গোড়া থেকেই দেখা যায় ব্লাস্ট ফার্নেসেই তাঁর প্রবল ঝোঁক। তিনি জামশেদপুর কারখানার ব্লাস্ট ফার্নেসগুলোকে ঢেলে সাজতে সাহায্য করেছেন। এর মধ্যে দৈনিক ১,০০০ টন লোহা গলানোর একটি ব্লাস্ট ফার্নেস তাঁর পরিকল্পনা মত নতুন করে তৈরী করা হয়েছে। আমাদের দেশে এধরণের প্রচেষ্টা এই সর্বপ্রথম।

চ্যাটার্জী এখন বিশেষ পরিকল্পনা বিভাগে এ্যাসিস্টেণ্ট চীফ ইঞ্জিনীয়ার। কার্যোপলক্ষে চ্যাটার্জী সারা পৃথিবী ঘুরেছেন এবং পৃথিবীর সব জায়গার ব্লাস্ট ফার্নেস বিশেষজ্ঞরা তাঁকে জানেন এবং শ্রদ্ধা করেন।

কর্মকুশলতা জামশেদপুরে কি ভাবে সমাদৃত হয় চ্যাটার্জী হলেন তারই আর একটি নিদর্শন···জামশেদপুরে শিল্প শুধু জীবিকা অর্জনের উপায় নয়, জীবনেরই অঙ্গ।

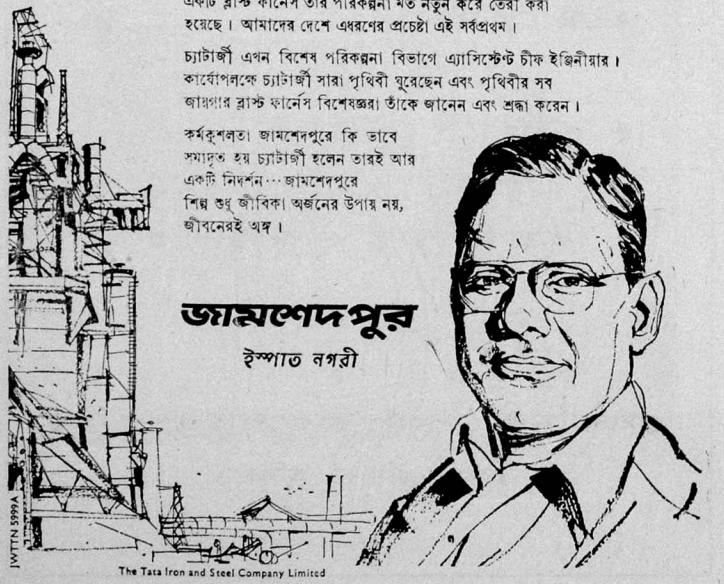

জামশেদপুর

ইস্পাত নগরী

JWTTN 5999A

The Tata Iron and Steel Company Limited

আপনার নিত্য প্রয়োজনে

দীপ্তি লণ্ঠন—এর পরিচয় নিষ্প্রয়োজন, এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার পেছনে আছে মজবুতী গঠন, সুন্দর আলো আর কম কেরোসিন খরচ।

"দীপ্তি" মার্কা জিনিষের পেছনে আছে বহুদিনের অভিজ্ঞতা, সুনাম আর ক্রেতার প্রতি অকৃত্রিম সেবার মনোভাব।

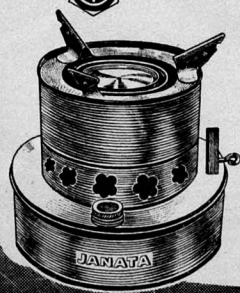

জনতা কেরোসিন কুকার—নিত্য প্রয়োজনের একটি আবশ্যকীয় জিনিষ। এই কেরোসিন ষ্টোভ ব্যবহারে কোন ঝামেলা নেই। গঠনে মজবুত, দেখতে সুন্দর, কাজে চমৎকার, খরচে সামান্য। অল্প সময়ে যে কোন রান্না করা যায়।

- ধুলো, নোংরা, ঝুল বা কালীর কোন বালাই নেই।
- কম কেরোসিন খরচ, ব্যবহারে কোন বিপদের সম্ভাবনা নেই।
- পলতে সব সময় পাওয়া যায়।

পেটেণ্ট নং ৬২৩৫৪

দি ওরিয়েণ্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

KALPANA.BN

সুন্দরম্। ষষ্ঠ বর্ষ। তেরশো উনসত্তর। চতুর্থ—দ্বাদশ সংখ্যা।

বিষয় : আন্তর্জাতিক ভাস্কর্য। চতুর্থ খণ্ড।

সূচীপত্র

দুটি আলেখ্য : **সুভো ঠাকুর**

সুভো ঠাকুর উবাচ

পশ্চিম জার্মানীর ভাস্কর্য	**দক্ষিণারঞ্জন বসু**
গুস্তাভ্ ভিগেলাণ্ড	**চিন্তামনি কর**
অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা	**দরবেশ**
আধুনিক ডাচ ভাস্কর্য	**অহিভূষণ দাশগুপ্ত**
আইসল্যাণ্ডের ভাস্কর্য	**সুহাস সেন**
প্যারিস কি মনে রাখে?	**সলিল ঘোষ**
দৃষ্টিকোণ	**হেনরী মুর। অ: শঙ্কর দাশগুপ্ত**
ভাস্কর্য সম্পর্কে বক্তব্য	**জিয়াকোমেত্তি। অ: রাণা বসু**
প্রদর্শনী পরিক্রমা	**বিশেষ প্রতিনিধি**
খবরাখবর	**নিজস্ব সংবাদদাতা**

অঙ্গসজ্জা | **রণেন আয়ন দত্ত-র অনুসরণে।**

শিল্পীদের জন্য এ-মাসের সবচেয়ে বড়ো খবর

সুন্দরম্-এর গত সংখ্যায় 'ললিতকলা' কর্তৃক আহূত 'শিল্পী-সম্মেলন' প্রসঙ্গে সুভো ঠাকুর ওয়ার্কিং আর্টিস্টদের স্বার্থরক্ষার সম্পর্কে যে মন্তব্য এবং প্রস্তাবনা এনেছিলেন আজ 'ললিতকলা'র অষ্টাদশ অধিবেশনে তা সুনিশ্চিত সফলকাম হোয়েছে। এই কৃতকার্যতার জন্য সুন্দরম্-এর কিছু অংশে আনন্দিত হবার অধিকার আছে বোধহয়।

বরদার কলা-বিশ্ববিদ্যালয়-এর অধ্যাপক বিখ্যাত ভাস্কর শঙ্খ চৌধুরীর কার্যকরী প্রস্তাবনায় এবং 'ললিত-কলা আকাদমি'র সভাপতি নবাব মেহেদী ইয়ার জঙ্গের শিল্পানুরাগ, বুদ্ধিমত্তা ও ঔদার্যের নিদর্শন স্বরূপ তা সচল হোতে সক্ষম হোয়েছে। অধ্যাপক শঙ্খ চৌধুরীর প্রস্তাব ছিল গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নির্বাচিত চেয়ারম্যান বা সভাপতি যদি শিল্পী না হন, তবে সহ-সভাপতি একজন কর্মরত শিল্পী বা ওয়ার্কিং আর্টিস্ট হবেন।

আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি ভারতের বিখ্যাত শিল্পী অধ্যাপক বেন্দ্রে 'ললিতকলা'র সহ-সভাপতির পদ এখন হোতে অলঙ্কৃত কোরলেন।

এবার আমরা দেখতে চাই—'ললিতকলা' কর্তৃক অনুমোদিত সকল শিল্পী-সংস্থা এবং শিল্প-আকাদমীতে নিদেনপক্ষে শতকরা আশী জন ওয়ার্কিং আর্টিস্টরা যেন অবস্থান করেন। তবেই সুন্দরম্-এর আন্দোলন পরিপূর্ণ জয়লাভ কোরবে।

Subho Tagore is leaving Calcutta to hold his exhibition in New Delhi this year. I bless his venture with all success because he is fearless in his approach to the problem of Indian Art—he is no follower of any school but is guided by his own interpretation of colours and forms. Subho deserves encouragement because through his Art he is interpreting India to the peoples of the world and thus uniting human forces in all spheres.

● উনিশশো চুয়ান্ন সালে সুভো ঠাকুর নিজের আঁকা চিত্র এবং সংগ্রহ নিয়ে বিদেশ যাবার প্রাক্কালে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উপরের শুভেচ্ছা-জ্ঞাপক বাণীটি পাঠিয়েছিলেন।

দুটি আলেখ্য

ওর বন্ধু জ্যোতিষ গুপ্তকে ও' বোল্লে, এখন নয় তখন
—তার মানে কখন ?

—অর্থাৎ যখন রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঢোকা হয়নি—তখন!

সুভো ঠাকুর বল্লে, অর্থাৎ রাইটার্স বিল্ডিং বা ওর ভাষায় 'কলমুচি কোঠায়' প্রবেশের তাগিদ ওর জীবনে তখনো ঘটে নি আর-কি। ডালহৌসি স্কোয়ারে ট্রামের পিঠে চোড়ে পরিক্রমণের সময় ওই বাড়ীটা কৌতুহলের সঙ্গে ও' নাকি প্রায় নজর কোরতো।

স্বাধীন হোয়েছে ভারতবর্ষ। কোলকাতার রাজ-ভবন বা গভর্ণমেণ্ট হাউসে ওর একক প্রদর্শনী হোয়ে গেছে দুচার দফা। শোনা যায়, মন্ত্রী আর ফোড়েদের পাঁচ-ফোড়নে সদাই সরগরম নাকি ওই লাল-কোঠা। সে সময় ওর প্রস্তুতি পর্ব। ওর ছবি এবং সংগ্রহ ইত্যাদি নিয়ে সমুদ্রপারের প্রদর্শনীর মহড়া চলেছে। বিদেশে ঐ প্রদর্শনী নিয়ে যাওয়ার খরচ বাবদ একটি বন্ধু ওকে ছ হাজার টাকা দিয়েছিল প্রারম্ভিক কাজের জন্য। খরচের ধাক্কায় সেই ছ হাজার টাকা, কাজ শেষ হবার অর্ধ-পথেই উবে গেছে। মহা দুশ্চিন্তায় অনিদ্র রজনী। এমত অবস্থায় একদিন ডালহৌসী পাড়ার এক বন্ধুর অফিস-কামরায় ওর মস্তিষ্কের হঠাৎ-খেলে-যাওয়া বুদ্ধি প্রবাহের প্রচণ্ডতায় লিখে ফেললো একখানা চিঠি তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে। পূর্বতন চেনা পরিচয় কিছুই নেই। এমন-কি একখানা সুপারিশপত্রও নয়।

এই পত্র পাঠাবার সময়ই সুভো ঠাকুর ভেবেছিল, বাংলায় লেখা শিল্পীর পত্র নিশ্চয়ই রাজনৈতিকের আবর্জনার চুপ্‌ড়ির কোলে কবরস্থ হবে। কিন্তু অবাক কাণ্ড! সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় টাইপ-করা একটি চিঠি—অবিলম্বে তাঁর বাড়ীতে দেখা করার নির্দেশ।

ও' তখন থাকে গণেশচন্দ্র এভিনিউর একটি ফ্লাটে। ডাঃ রায়ের বাড়ীর খুবই কাছাকাছি।

ডাঃ রায়ের সঙ্গে দেখা হোল। উদ্দেশ্য ছিল দেশান্তরে যাওয়ার পূর্বে একটি বাণী সংগ্রহ করা—এবং সেই বাণীর দৌলতে রাজস্থানী বন্ধুদের কাছ থেকে যদি কিছু রাহা খরচ মেলে।

সুভো ঠাকুর গভর্ণমেণ্ট হাউসে সর্বশেষ বারে তার একক প্রদর্শনীর অভিজ্ঞতায় এই ধারণার মুখোমুখি হয় যে, 'পারমিট' দেওয়ার মালিকের বাণী অথবা সুপারিশ ওই সমস্ত রাজস্থানী কলা-রসিকদের কাছে আদতে মূল্যবান। নচেৎ রাজ্যপালক এবং মেষপালক-এর ব্যবধান, দুইই সমান হোয়ে যায় উপরোক্ত বন্ধুদের কাছে। ডাঃ রায় পারমিটের মালিক ছিলেন কতখানি এবং কিরকমভাবে—সে ব্যাপারে সুভো ঠাকুরের কোন অভিজ্ঞতা না থাকলেও মাড়বার প্রদেশীয় বন্ধুদের কাছে তাঁর আসন সিংহাসনের সমান ছিল—এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

এর পর ডাঃ রায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ-কালে ডাঃ রায়কে ওর নিজের আঁকা ছবির একটি বই উপহার দিতে—দুচারটে ছবি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদের পর তিনি বল্লেন, 'আচ্ছা, তোমাকে আমি সাহায্য কোরব।' অতঃপর ও' তাঁর ঘর থেকে বেরোতেই তাঁর শিণ্টাচারী ও প্রিয়ভাষী পি, এ-দের মধ্যে একজন অত্যন্ত বিনয় সহকারে বল্লেন, 'ওই তো আপনার সব হোয়ে গিয়েছে। আর ভাবনা কিসের! উনি তো আপনাকে সাহায্য কোরবেন বোলে-ছেন। আপনি দয়া কোরে পরশু দিন রাইটার্স বিল্ডিং-এ এলেই জানিয়ে দিতে সক্ষম হবো'।

এই সাহায্যটি কি আর্থিক, না পরমার্থিক, না কেবল-

নিজস্ব দপ্তরে মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন।

মাত্র একটি বাণী—কিছুই তা ও' বুঝতে পারলো না। তবে সে পি. এ-র কথামত সেই সাহায্যের রহস্য উদ্ঘাটনের সম্ভাবনায় রাইটার্স বিল্ডিং-এ কোরল পদার্পণ। সেই ওর প্রথম পদার্পণ ওখানে। ওর বাল্য বন্ধু এবং সহপাঠী এম. এম. বাসু তখন হোম ডিপার্টমেণ্টের জয়েণ্ট সেক্রেটারী। তার সঙ্গে তার কামরায় আলাপ অন্তে কথায় কথায় এই ঘটনার বিবরণ দিলে বন্ধুটি জিজ্ঞেস কোরলেন, 'চিফ মিনিস্টারের কোন পি. এ-র সঙ্গে তোমার দেখা হোয়েছে?' কিন্তু সুভো ঠাকুর সেই পি. এ-র নাম পর্যন্ত জানতো না। এম. এম-এর কিন্তু উৎসাহের অন্ত নেই। টেলিফোনে খুঁজে খুঁজে ও' ঠিক বের কোরেছে—তারপর শোনা গেল শুধু বাণী নয়, বাণীর সঙ্গে রাহা খরচেরও ডাঃ রায় সুরাহা কোরে দিয়েছেন। মারবাড়বাসী রাজস্থানীদের রাজ-দরবারে এ-ব্যাপারে আর ওকে যেতে হয় নি। চিফ মিনিস্টারের ব্যক্তিগত তহবিল থেকে সুরু কোরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নানা বিভাগীয় দপ্তর থেকে প্রায় দশ বারো হাজার টাকা তখন ও' আশার অতিরিক্ত পেয়েছিল।

ডাঃ রায়ের সেই সাহায্য সুভো ঠাকুর আজীবন কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ কোরবে। উক্ত ঘটনার পর ডাঃ রায়ের কাছে ওর বিদেশ যাওয়ার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ভরসা পাওয়ার পর যখনই সাহায্যের আবেদন কোরে চিঠি লিখেছে তাঁর সাহায্য পেয়েছে তৎক্ষণাৎ। স্পেশাল ম্যাসেঞ্জার মারফৎ তার উত্তর ও সমাধান একবার না, বহুবার লাভ কোরেছে। সুন্দরম্ বিশেষভাবে গৌরবান্বিত যে তাঁর মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ব্যক্তিকেও সে কবলিত কোরতে সক্ষম হোয়েছিল। সুন্দরম্-এর প্রথম বছরের, দ্বিতীয় সংখ্যায় 'জাপানের সৌন্দর্যবোধ' নামক লেখাটি শিল্প ও সৌন্দর্য সম্পর্কে তাঁর আন্তরিকতার পরিচয় সর্বতোভাবে রসিক-সুজনের প্রশংসা অর্জন কোরেছিল। এই লেখাটিই বোধকরি তাঁর বাংলায় এবং শিল্প সম্পর্কে প্রথম ও শেষ রচনা। সুন্দরম্ অনুভব কোরেছে শাহেনশা বাদশার মতো বিরাট তাঁর বক্ষদেশ উন্মুক্ত রয়েছে সকল উপযুক্ত লোককে সাহায্য করার করার জন্য। সকলের সব মতামত অগ্রাহ্যকারী সেই বাদশাহী মেজাজ থেকেই সত্যজিৎ রায়ের পথের পাঁচালীকে সাহায্য করা সম্ভব হোয়েছিল। অন্য কারোর দ্বারা এইরূপ অঘটন ঘটা কতখানি সম্ভব সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে।

সুভো ঠাকুর উত্তাপ সহকারে আলাপন, উত্তেজনা সহকারে বন্ধুত্ব কোরে বেড়ালেও কতকগুলি ব্যাপারে ও নেহাৎ শীতলতা সন্দর্শনকারী। ইংরাজীতে যার উচিত অনুবাদ—কোল্ড। যথা, মিনিটের আলাপে তো দূরের কথা, বহু বছরের প্রগাঢ় পরিচিতিতেও দাদা, দিদি, মা, মাসিমা ওর মুখ দিয়ে উচ্চারিত হোতে নিতান্তই কুণ্ঠিত।

সুভো ঠাকুর দেখেছে ওর অনেক পরিচিত ব্যক্তি যারা আধুনিক অভিধান অনুযায়ী 'ফোড়ে' নামে অভিহিত—মন্ত্রী মহাশয়-এর পি. এ-র পাশে বোসে দূরের থেকে মুহূর্তের জন্য মন্ত্রী মহোদয়ের চেহারা দেখে তৎক্ষণাৎ 'দাদা' বানিয়ে ফেলেছে। ও' স্বনামধন্যা এক মহিলাকে দেখেছে—কোন একটি ভি. আই. পি-র আগমন হোলেই কি কোরে যে তিনি নিঃসীম নীল থেকে আবির্ভূতা হোতেন—তা এক অষ্টম আশ্চর্যের ঘটনা। ভি. আই. পি-দের পাশে তাঁর ছবি কাগজে প্রত্যহ প্রকাশিত করা চাই-ই।

বন্ধুবর জ্যোতিষ গুপ্ত-র সঙ্গে এই নানা আলোচনা কোরতে কোরতে ও' চলেছিল সেদিন চন্দননগরে—গঙ্গার ধারের সুন্দরম্-এর নতুন খোলা ব্রাঞ্চ অফিসের উদ্দেশ্যে। গ্রাণ্ডট্রাঙ্ক রোডের উপর মোটর থামিয়ে একটি চায়ের দোকানে বোসে ওরা তখন চা খাচ্ছিল। বেলা আটটা কি নটা হবে। চায়ের দোকানের সামনে পাড়ার ছেলেদের যথারীতি জটলা। এমন সময় একটি গাড়ীতে খবরের কাগজে মুখ ঢাকা অবস্থায় খাদ্য এবং ত্রাণ মন্ত্রী প্রফুল্ল সেন হুশ্ কোরে বেরিয়ে গেলেন। হৈ হৈ কোরে উঠলো সবাই, 'ঐ যে আমাদের প্রফুল্লদা গেল।'

সেই সেদিন চায়ের দোকানে সাধারণ্যের মাঝখানে জ্যোতিষ গুপ্ত আর ও' স্বতঃস্ফূর্ত সকলকার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে নিজের অজান্তেই কখন ডেকে ফেললো 'প্রফুল্লদা'।

শ্রদ্ধেয় প্রফুল্ল সেন মন্ত্রী হওয়ার পূর্বে, মন্ত্রী হওয়ার পরে এবং এমন-কি মুখ্যমন্ত্রী হোয়েও তিনি আমাদের হৃদয়ের লোক বাংলার একান্ত অন্তরের লোক, আমাদের সুখদুঃখের সমান ভাগীদার প্রফুল্লদা।

এমন সময় হঠাৎ চমক ভেঙে যেন সুভো ঠাকুর জ্যোতিষকে জিজ্ঞেস কোরল : আচ্ছা, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়কে কেউ কি কখনো সাধারণ থেকে এমনিতর 'বিধানদা' বোলে ডাকতে পেরেছে?

সুভো ঠাকুর উবাচ

সরকার ও জনগণ ভুয়া পেট্রনদের হাত থেকে দেশের শিল্পীদের রক্ষা করুন।

ভারত সরকারের অধীনস্থ পুরোদস্তুর সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনে যে কটি শাখা-প্রশাখা আছে তন্মধ্যে সবচেয়েও হতাদর, অবহেলা, অবজ্ঞা এবং অজ্ঞতায়, সদাই বর্ধিষ্ণু যে বিভাগ, সে-বিভাগের নাম ললিতকলা। এই বিভাগের কর্মকাণ্ডের তুলনা ভূ-ভারতে কোথাও নেই। কি রাজ্য সরকার, কি কেন্দ্রীয় সরকার, সর্বত্রই দেখা গেছে এই কলা-বিভাগ চরম যথেচ্ছাচারিতার মধ্যে অবস্থান কোরছে।

ভারত সরকারের বিজ্ঞান-বিভাগে, এমন কি ললিত-কলার দোসর সাহিত্য-বিভাগেও এইরূপ অসামান্য ঔদাসীন্য অথবা যথেচ্ছাচার কদাপি পরিলক্ষিত হয়।

আজ হোতে পশ্চাতে পড়ে-থাকা সহস্র বৎসরের বিরাট বিস্তৃতি যথাযথ জরিপ কর্ম সমাপনান্তে দেখা যায়—বিজ্ঞানে ভারতবর্ষের দান সম্পর্কে কুত্রাপি তেমন কোনো স্বীকৃতি পরিদর্শিত হোয়েছে! তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি সরকারের সমাদরপূর্ণ সহযোগিতার অন্ত নেই। এটা খুবই শুভলক্ষণ নিঃসন্দেহে। যেখানে চারু ও কারু শিল্প বিভাগে অজন্তা, ইলোরা, কোণারক থেকে এই সেদিনের বয়নশিল্প মসলিন অব্দি-র স্বীকৃতি ভারত-বর্ষেই শুধু নয়, ভারতবর্ষের বাহিরেও উচ্ছসিত। দূর পাল্লা প্রশংসার আকাশে আজিও সুনিশ্চিত পক্ষ-সঞ্চালনকারী। কিন্তু তাহোলে কি হবে, শিল্পের এবং শিল্পীর সত্যিকারের সমাদর এযাবৎকাল আমাদের দেশের অন্তর থেকে উত্থিত হয়নি, ঠোঁটের আগায় পর্যবসিত মাত্র। ইংরাজীতে যাকে বলে লিপসিম-প্যাথি—তাই। এই স্বাধীন ভারতে সরকারের তরফ থেকে শিল্পীদের প্রতি সমাদরের নামে অশিল্পী ধনী পৃষ্ঠপোষকদের সমাদরই সবচেয়ে বেশী দেখা যাচ্ছে। ললিতকলার পদ্মবনে এঁরাই মদমত্ত হস্তী এবং হস্তীনির ন্যায় শিল্পীদের নরম স্কন্ধে পা দিয়ে দাপা-দাপি কোরে বেড়াচ্ছেন।

সর্বসাধারণের কাছে এবং শিক্ষিত সংস্কৃতি মন্ত্রী মহাশয়ের কাছে একটি প্রশ্ন যে বিজ্ঞান বিষয়ক সংস্থা বা সায়ান্স অ্যাকাদমীতে সায়ান্স-পেট্রনের যদি আবি-র্ভাব না হয়, সাহিত্য অ্যাকাদমীতে সাহিত্য-পেট্রনের সাক্ষাৎ দর্শন যদি না মেলে তবে শিল্প—যা উচ্চশ্রেণীর টেকনিক্যাল বা বিশেষজ্ঞদের ব্যাপার বোলে অধুনা সর্বজনস্বীকৃত—তার বেলা সরকারের সরাসরি সহায়তায় কার্পণ্য কেন? কলাক্ষেত্রে এই তথাকথিত পেট্রনদের প্রাদুর্ভাব ও প্রাচুর্য সাধারণ শ্রেণী হোতে আগত মন্ত্রী-দের ধনিক সম্প্রদায়ের প্রকারান্তরে চাটুকারিতার মনো-ভাব প্রকাশিত। শিল্প সম্পর্কে ঔদাসিন্য অথবা নিতান্ত অনভিজ্ঞতাই কি এর হেতু ধরলে অতিশয়োক্তি হবে?

পূর্বকালে যখন মহারাজা, রাজা, জমিদার কুলের কৌলিন্য ছিল তখন শিল্পের পেট্রন বা পৃষ্ঠপোষকদের একটা মানে হোতো। এখন সামন্ততন্ত্র অবসানের পর সওদাগর তথা বাণিজ্যকারী এবং ব্যাপারীদের যুগে পৃষ্ঠপোষক কোথায়? বর্তমানে সমাজে যাঁরা যাত্রাদলের রাজারাণীর মতো শিল্পের পৃষ্ঠপোক সেজে বসে আছেন তাঁরা তো দালালমাত্র। সরকারী সাহায্য এবং অর্থ যা শিল্পীদের জন্য বরাদ্দ তা কৌশলে তাঁরা হস্তগত কোরে নির্বোধ শিল্পীদের কাছে তাঁদের উপকারী বন্ধু সেজে প্রতিদিন খবরের কাগজে ছবি ওঠান।

অতঃপর আমাদের এই জনকল্যাণকামী রাষ্ট্রের কাছে এবং তাঁদের মন্ত্রী উপমন্ত্রীদের কাছে সুন্দরম্ মারফৎ একটিমাত্র আবেদন : ভারতীয় শিল্পীদের—বিশেষ কোরে বাংলাদেশের শিল্পীদের যদি বাঁচাতে হয়, তবে এইসব পৃষ্ঠপোষকদের হাত থেকে দেশের শিল্প ও শিল্পীদের রক্ষা করুন। সরকার শিল্পীদের সাহায্যার্থে যে অর্থ ও সুযোগ দিতে চান তা যেন সরাসরি তাঁদের হস্তেই অর্পণ করুন।

এক্ষণে সরকার বাহাদুর স্বচ্ছন্দে বাংলাদেশের ওয়ার্কিং আর্টিস্টদের আহ্বানপূর্বক একটি ইউনিয়ন গঠন কোরে তাঁদের হাতে অর্থ দিলেই সব সমস্যার সমাধান হয়। ওয়ার্কিং আর্টিস্ট ইউনিয়নের পৃষ্ঠ-পোষক হিসাবে শ্রদ্ধেয় নন্দলাল বসু এবং যামিনী রায় মহাশয়দ্বয়কে সব শিল্পী সাদরে আমন্ত্রণ জানাতে কদাপি কুণ্ঠিত হবেন। সভাপতির আসনে শিল্পী অতুল বসু ও সহ-সভাপতি শিল্পী সতীশ সিংহ, বসন্ত গাঙ্গুলি ও পূর্ণ চক্রবর্তী সর্বৈবভাবে উপযুক্ত হোতেন বোধহয়। এ-ছাড়া শিল্পী গোপেন রায় প্রমুখ আরো কার্যকারী শিল্পীদের নাম আমরা দিতে পারি। এ-বিষয় সরকার সক্রিয় সাহায্য কোরে ভুয়া পেট্রনদের হাত থেকে বাংলাদেশের শিল্পীদের বাঁচান এই আমাদের অভিমত।

শিল্পীদের কাছে কোলকাতার এই আর্ট কলেজ—কোলকাতা য়ুনিভার্সিটির ন্যায়ই ঐতিহ্য বহন কোরে আসছে। শিল্পীদের সেই শিক্ষাতীর্থে গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজ-এর উপদেষ্টা মণ্ডলীতে হাস্যাস্পদ ঘটনা এই যে—একটিও স্বনামধন্য বা কুনামধন্য নবীন বা প্রবীণ শিল্পীর নাম তাতে নেই। তার পরিবর্তে বেশীর ভাগ অশিল্পী বৃটিশ আমলের শ্বেতাবধারী অজ্ঞ নরনারীর নিরর্থক সমাবেশে সমস্ত শিল্পশিক্ষার আবহাওয়া বিষবাষ্পের বিষাক্ত হাওয়ায় মুহ্যমান এবং মুমূর্ষপ্রায়।

আমাদের নতুন মুখ্যমন্ত্রী ও অতুলনীয় ক্ষমতার অধিকারী কংগ্রেস সভাপতি দুজনেই ধনিক বণিক অথবা শোষণকারী সম্প্রদায়ের নন। তাঁরা নিজেরা জনগণমনের সত্যিকারের প্রতীক এবং স্বভাবতই জনসাধারণের হৃদয়ের লোক। তাই সুন্দরম্ মারফৎ শিল্পীদের এই আবেদন রইল তাঁদের কাছে।

সাম্প্রতকালের জার্মানীর স্বনামধন্য ভাস্কর এরিক, রেটার নিজস্ব স্টুডিও-র কর্মরত।

পশ্চিম জার্মানীর সমকালীন ভাস্কর্য

দক্ষিণারঞ্জন বসু

বাংলার অগ্রগণ্য দৈনিক 'যুগান্তর'-এর বার্তা সম্পাদক। বিশিষ্ট লেখক হিসাবেও সুপরিচিত। বহু গ্রন্থের প্রণেতা। সম্প্রতি পত্রিকা সংশ্লিষ্ট কাজে জাপানে পর্যটন। সাংবাদিক এবং সাহিত্যিক হিসাবে দুবার বিশ্বপরিক্রমা। ইতিপূর্বে আমেরিকার বিখ্যাত আর্ট গ্যালারী পর্যটনান্তে সুন্দরম্-এ একটি মূল্যবান প্রবন্ধ রচনা কোরে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছিলেন।

উনিশ শতকের শেষ থেকে হাল আমল পর্যন্ত আমরা যদি সমসাময়িক কাল বলে ধরে নি' তাহলে দেখতে পাব এই সময়ের মধ্যে জার্মাণ জাতির জীবনে নানা ধরণের পরিবর্তন এসেছে। এ পরিবর্তনের প্রধান ও প্রথমটি হলো জাতীয়তাবোধের তীব্রতা বৃদ্ধি। জার্মাণ সাহিত্য ও শিল্পে তার পরিচয় ক্রমশঃই আমরা স্পষ্ট হয়ে উঠতে দেখেছি। কলাশিল্পের ক্ষেত্রে ফরাসী প্রভাব কাটিয়ে ওঠবার দুরন্ত চেষ্টার মধ্যে আমরা তা প্রত্যক্ষ করেছি। তারপরে এসেছে নাৎসী যুগ। হিটলারী একনায়কত্বের রথচক্রতলে ব্যক্তিস্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে পিষ্ট হয়ে চলেছে সমস্ত সাহিত্যচিন্তা ও শিল্পচিন্তা।

একনায়ক শাসনব্যবস্থার চরিত্রই এই—তার ভয়াবহ দৃষ্টি যেমন সর্বগ্রাসী তেমনি সর্বতগামী। নুন খাও আর না-ই খাও একনায়ক প্রভুর গুণ গাইতেই হবে—শুধু রাজনীতিকদের নয়, শিল্পী-সাহিত্যিকদেরও। এ ব্যবস্থার এ-ই বিধান। সকল রকম কলাবিদ্যা সম্পর্কেই একচ্ছত্র রাষ্ট্র প্রভুদের শ্রদ্ধা অপরিসীম। তাঁরা কলাশিল্পী ও সাহিত্যিকদের কেবল মাত্র নীরব সমর্থনেই সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না—তাঁদের চাই মুখরিত সমর্থন অর্থাৎ বন্দনা-সম্বর্ধনা এবং তা আসবে সাহিত্যিকের সাহিত্যের মধ্যে দিয়ে ও শিল্পীর শিল্পকর্মে। কোনো একনায়ক শাসিত দেশেই শিল্পী ও সাহিত্যিকদের রাজনীতিগত নিরপেক্ষতাকে যথেষ্ট বলে গণ্য করা হয় না। অধিনায়ক ও তাঁর শাসননীতির প্রকাশ্য প্রশস্তি যতক্ষণ পর্যন্ত না অকুণ্ঠ বলে বিবেচিত হবে ততক্ষণ কোনো শিল্পী বা সাহিত্যিকের আনুগত্যই সন্দেহাতীত বলে ধরা হবে না, একনায়ক-রাষ্ট্রের এই রীতি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এরকম অনেক নজীরই আমাদের চোখে পড়েছে—স্টালিনের রাশিয়া, মুসোলিনীর ইতালী এবং হিটলারের জার্মানীর কথা স্মরণ

করলেই যে সব চিত্র আমাদের মনের দর্পণে ভেসে উঠবে তাতেই পূর্ব বক্তব্যের নানা প্রমাণ-পরিচয় সুস্পষ্ট দেখা যাবে।

ইতিহাসে বার বার দেখা গেছে একচ্ছত্রাধিপতির দেশ শাসনের পূর্ণ কর্তৃত্ব লাভ করেই সম্পূর্ণ তৃপ্ত হতে পারেন নি, দেশের আপামর জনমণ্ডলীর মনোরাজ্যে আধিপত্য বিস্তারে তাঁরা প্রয়াসী হয়েছেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তার জন্যে জঙ্গীনীতি ও জবরদস্তির আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু মুস্কিল হলো এই, শুধুমাত্র মারের ভয়ে বা লোভের বশবর্তী হয়ে দেশশুদ্ধ লোক একনায়ক প্রভুর প্রেমানুরাগী হয়ে উঠবে, এমন আশা নিছকই দুরাশা। তাই কোনো দেশে কোনো কালেই শিল্পের সত্য ও সাহিত্যের সত্যকে কোনো একচ্ছত্রাধীপের পক্ষেই নির্মূল করা সম্ভব হয়নি।

এইসব একচ্ছত্র রাষ্ট্রনেতাদের রাজনৈতিক নিষ্ঠুরতার কথা সর্বজনবিদিত এবং তা' সর্বকালে সর্বজন নিন্দিতও। সে বিষয় নিয়ে এখানে আমার কোনো বক্তব্য নেই। কিন্তু দেশের শিল্পসাহিত্য ও ব্যক্তিগত চিন্তাচর্যার ক্ষেত্রে শাসক সম্প্রদায়ের মোড়লী এবং নীতি-নির্দেশ নিতান্তই বেদনাদায়ক। তবে বর্তমান প্রবন্ধে আমি স্ট্যালিনের রাশিয়া বা মুসোলিনীর ইতালীর কোনো বিষয় নিয়েই আলোচনা করব না, আমার আজকের আলোচ্য সমকালীন জার্মাণ ভাস্কর্য। সে আলোচনা আরম্ভ করতে গিয়েই বলতে হয়, নাৎসী-নেতা হিটলার অতি অল্প সময়ের মধ্যেই জার্মানীর ঐতিহ্যপুষ্ট শিল্পকলা ও সাহিত্যকে সম্মানের সুউচ্চ আসন থেকে এতদূর নীচে নামিয়ে এনেছিলেন যা প্রত্যেক শিল্পমনা ও সাহিত্যমনা মানুষের কাছেই অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলে মনে হয়েছে।

নাৎসী জার্মানীতে সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রেই হিটলারী দাপট প্রভূত পরিমাণে অনুভূত হয়েছে। তবে সঙ্গীত শিল্পের চাইতে কলাশিল্পের ওপরেই নাৎসী মুষ্ট্যাঘাতটা বেশি জোর হয়েছে। অনেক ভাস্কর ও চিত্রশিল্পীকে সমাজচ্যুত করা হয়েছে পতিত এবং বিপথগামী শিল্পী বলে। যে একস্‌প্রেসনিজম নিয়ে প্রথম মহাযুদ্ধের আগে থেকেই জার্মাণ শিল্পক্ষেত্রে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে আসছিল সেই একস্‌প্রেসনিজমকে জার্মাণভাষী এলাকা থেকে মূলতঃ নির্বাসিতই করা

পশ্চিম জার্মানীর মহিলা ভাস্কর নেলে বোড ও তাঁর ভাস্কর্য।

হয়েছিল। বাস্তবতার নামে সে সময় জার্মানীতে বিরাটত্বের ও বিকটত্বের দিকে একটা ঝোঁক সৃষ্টির যে চেষ্টা চলেছিল শিল্পের জগতে সেই অপ-প্রয়াসের পরিবেশ আজো যে পূর্ণ মুক্তিলাভ সম্ভব হয়েছে এমন কথা বলা যায় না। আর এ খুব সহজ ব্যাপারও নয়।

রেনে সিণ্টেনিস সৃষ্টিরতা। ইনিও পশ্চিম জার্মানীর মহিলা ভাস্করদের মধ্যে একজন।

কারণ বহু কৃতী সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীর মতো অনেক সেরা সেরা শিল্পী-ভাস্করকেও দেশত্যাগী হতে হয়েছে স্বধর্ম ছেড়ে নাৎসী-শাসনের প্রচারকার্যে অংশগ্রহণে অপারগতার জন্যে। অনেকে শিল্প-সাধনা বন্ধ রেখে দিন গুণে চলছিলেন, কবে আঁধার ঘুচবে, কবে সেই দুঃশাসনের কাল কাটবে। কিন্তু দীর্ঘ এক যুগ পরে সে দুর্যোগের যখন অবসান ঘটল জার্মানী তখন মহাশ্মশানে পরিণত!

জার্মানীর বহু আর্ট মিউজিয়ামই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বিধ্বংস হয়ে গেছে। তবে সুখের কথা, অনেক ক্ষেত্রেই মূল্যবান শিল্প-সম্পদসমূহ আগে থেকে সরিয়ে রেখে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে। এবং যুদ্ধান্তে একের পর এক করে অধিকাংশ আর্ট মিউজিয়ামই আবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

যুদ্ধ-পূর্ব কালের মতো আজও মিউনিককেই বোধহয় জার্মাণ কলাশিল্পের প্রাণকেন্দ্র বলা চলে। শিল্প-কর্মের সংগ্রহের দিক থেকেও মিউনিক বোধহয় জার্মানীতে অদ্বিতীয়। এই শহরের পার্কে-উদ্যানে পথে-প্রাঙ্গনে সর্বত্রই কবি-সাহিত্যিক ও দার্শনিক-রাজনৈতিক অধিনেতাদের মর্মরমূর্তি যে কোনো বিদেশীর দৃষ্টিকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করে থাকে। মিউনিকের উপকণ্ঠে অবস্থিত স্থাপত্য শিল্পের অপূর্ব নিদর্শন নিম্ফেনবুর্গ প্রাসাদ পরিদর্শনে গিয়ে প্রাসাদ উদ্যানে রক্ষিত মূর্তি রাজি দেখে মোহিত হয়েছিলাম। কিন্তু এ সবই পুরণো যুগের ভাস্করদের কৃতিত্বের স্বাক্ষর। সমকালীন ভাস্কর্যে মিউনিকে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করেছেন বিশেষভাবে দু'জনের নাম এখানে করা যেতে পারে, তার মধ্যে একজন হলেন আর্নেস্তো দে ফিওরি এবং অন্যজন গেয়র্গে কলবে। ফিওরি আসলে রোমের লোক, রোমেই তাঁর জন্ম ১৮৮৪ সালে। অবশ্য তাঁর শিল্পশিক্ষা শুরু হয় মিউনিক আকাদেমিতে এবং চিত্রাঙ্কনেই তিনি প্রথমে হাত পাকান। চিত্রশিল্পে শিল্পী হোলদারের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। কিন্তু তাঁর ওপর সে প্রভাব খুব বেশি দিন স্থায়ী

পশ্চিম জার্মানীর বিখ্যাত ভাস্করদের একজনকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাঁর কাজের নিদর্শন-সহ। কয়েকটি মানুষের মূর্তিই এই ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু।

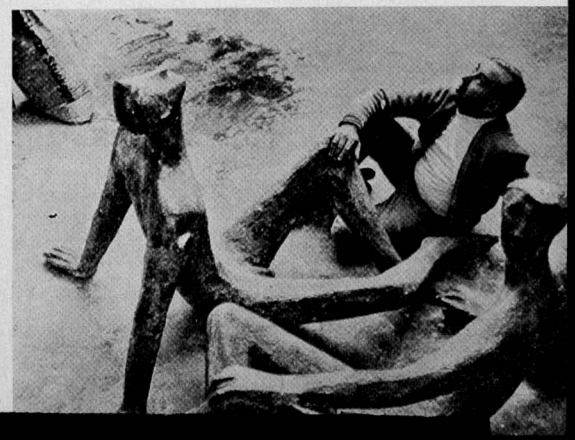

ডানদিকের ভাস্কর্যটিতে মানুষের মূর্তিগুলির মাঝখানে ভাস্করকে খুজে বের কোরতে হয়। কেননা মূর্তিগুলির বিভিন্ন 'মুড'-এর সঙ্গে ভাস্কর যেন নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছেন।

হান্‌স উহ্‌লমান—পশ্চিম জার্মানীর ভাস্কর। তাঁর একটি বিশেষ মুড এই আলোকচিত্রে আশ্চর্য আকর্ষণীয় ভাবে পরিস্ফুট হোয়ে উঠেছে।

হতে পারেনি। তার কারণ ১৯১১ সালে প্যারিতে এসে তিনি প্রখ্যাত ভাস্কর মেলল্‌এর ভাস্কর্যের প্রতি এমন আকৃষ্ট হয়ে পড়েন যে তাঁরই অনুকরণে তিনি সে সময়ে পর পর বেশ কিছু শিল্পসৃষ্টি করে চলেন। এর আগে পর্যন্ত তিনি শুধু ছবিই আঁকতেন, কিন্তু মেলল্‌এর প্রভাব তাঁকে পুরোপুরি ভাস্কর্যের দিকে টেনে নেয়। প্যারি থেকে জার্মানীতে ফিরে এসে ফিণ্ডার কিছুকাল বের্লিনে কাটান এবং তারপর ব্রেজিলে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সেই দেশে সাও পাওলোতেই এই খ্যাতিমান ভাস্করের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়। তাঁর বিখ্যাত ভাস্কর্য নিদর্শনগুলোর মধ্যে সাড়ে পঞ্চাশ ইঞ্চি দীর্ঘ ব্রোঞ্জের তৈরি মূর্তি 'সৈনিক' (১৯১৮) হামবুর্গের কুনস্তহলে রক্ষিত আছে এবং তা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মিউনিকের শিল্পী বলে খ্যাত অপর সমকালীন ভাস্কর গেয়র্গে কলবে তাঁর পরবর্তী ফিণ্ডারির চেয়ে সাত বছরের বড়ো এবং তাঁদের দু'জনের মধ্যে অনেক মিল। তিনিও ঠিক মিউনিকের সন্তান নন এবং তিনি জন্মেছিলেন ১৮৭৭ সালে ওয়াল্ড হেইমে। তাঁরও শিল্পজগতে আবির্ভাব ঘটে চিত্রবিদ্যা শিক্ষার মধ্যে দিয়ে। অধুনা পূর্ব জার্মানীর অন্তর্গত ড্রেসডেন আকাদেমি এবং পরে মিউনিক আকাদেমিতে তিনি শিল্প-শিক্ষা লাভ করেন। ১৮৯৮ সালে প্রথমে প্যারিতে এবং তারপরে রোমে এসে ভাস্কর্য শিল্পের দিকে তিনি বিশেষভাবে ঝুঁকে পড়েন। পরের দু'বছর তিনি ভাস্কর্য শিক্ষাতেই নিবিষ্ট থাকেন। দেশে ফিরে এসে কিছুকাল

লেহ্‌মব্রুক-কৃত ভাস্কর্য : বিবসনা।

হের্মান ব্রুমেন্থাল-কৃত ভাস্কর্যটির নাম : উপবিষ্টা। পশ্চিম জার্মানীর একজন বিখ্যাত ভাস্কর ইনি।

মিউনিক ও অন্যান্য স্থানে ১৯০৪ সাল থেকে বের্লিনেই স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই জার্মানীর অন্যতম জনপ্রিয় শিল্পী হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। নাৎসী শাসনে ও যুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় কলবের শিল্প-সাধনা বিশেষভাবে ব্যাহত হলেও তাঁর তৈরি অন্ততঃ পনেরোটি মর্মর ও ব্রোঞ্জমূর্তি বের্লিন, মিউনিক ও অপরাপর জার্মাণ শহরে গেয়র্গে কলবের শিল্প-কৃতির সাক্ষ্য বহন করছে। তাঁর মস্ত বড়ো কীর্তি ব্রোঞ্জে তৈরি ছয় ফুট তিন ইঞ্চি দীর্ঘ আসুন্নতা মূর্তি (১৯২১) 'ডেট্রয়েট ইন্সটিট্যুট অব আর্ট'-এ সংগৃহীত হয়ে আছে। এই স্বনামধন্য ভাস্করের লোকান্তর ঘটে ১৯৪৭ সালের নভেম্বরে।

দক্ষিণ থেকে উত্তরে আসা যাক, মিউনিক থেকে হামবুর্গে। হামবুর্গের বিখ্যাত ভাস্কর এণ্ড্রিজ শ্লুটার বের্লিনে এসে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছিলেন পুরণো যুগে। শ্লুটারের কীর্তি-কাহিনী নিয়ে হামবুর্গবাসীদের গৌরবের অন্ত নেই। 'গেটওয়ে টু দি ওয়ার্ল্ড' নামে খ্যাত বন্দর-নগরী হামবুর্গের অধিবাসীরা জার্মাণ জাতির শ্রেষ্ঠ রাজনীতিক ও রাইখের প্রতিষ্ঠাতা চ্যান্সেলার বিসমার্কের সম্মানার্থে এলব নদী তীরবর্তী এই নগরীর প্রবেশ মুখে যে বিরাট মনুমেণ্ট তৈরি করিয়ে রেখেছেন স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের দিক থেকে তা সত্যি সত্যি অনুপম। বিরাট মনুমেণ্টের উপর দাঁড়িয়ে জার্মানীর ভাগ্যনিয়ন্তা বিসমার্ক যেন এলব নদীপথে অগ্রসরমান জাহাজগুলোর দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করছেন। ঐ জাহাজগুলোই তো হানজ্ শহর হামবুর্গ এবং গোটা জার্মাণ রাষ্ট্রের জন্যে নানা দেশ-বিদেশ থেকে ভারে ভারে সম্পদ আহরণ করে আনছে। আমার মনে হয়েছে, সেজন্যেই বিসমার্কের আনন্দ এবং দেশবাসীকে বাণিজ্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করাবার জন্যে জাহাজগুলোর দিকে অমনি করে তাঁর অঙ্গুলি নির্দেশ। যে স্থাপত্যশিল্পী ঐ মনুমেণ্ট নির্মাণ করেছেন এবং যে ভাস্কর বিসমার্কের ঐ মূর্তির নির্মাতা তাঁদের পরিচয় জানবার অবকাশ আমার হয়নি, তবে সবার মতো আমারও দৃষ্টি এই অপূর্ব স্মৃতিস্তম্ভের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের শিল্পকর্ম হিসেবে জার্মানীর সমকালীন শিল্পের ইতিহাসে এর স্থান অনিবার্য বলেই আমার মনে হয়েছে।

হামবুর্গের সমকালীন প্রখ্যাত ভাস্করদের মধ্যে এখানে অন্ততঃ দু'জনের নাম করা যেতে পারে। তার মধ্যে আর্নষ্ট বারলাখ জন্মেছিলেন উনিশ শতকের শেষভাগে ১৮৭০ সালে, কিন্তু তাঁর খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয় দশকে। প্রায় আট বছরকাল তিনি শিল্পশিক্ষায় অতিবাহিত করেন—প্রথমে তাঁর জন্মনগরী হামবুর্গে, পরে ড্রেসডেনে। তারপরে উচ্চতর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্যে বারলাখ প্যারিতে চলে আসেন ১৮৯৫ সালে। এখানে এসে চিত্রাঙ্কনের দিকে তিনি ঝুঁকে পড়েন এবং ভ্যানগগের খুব ভক্ত হয়ে পড়েন। এক বছর পরে দেশে ফিরে এসে চিত্র ও ভাস্কর্য উভয় ক্ষেত্রেই তিনি দক্ষতার পরিচয় দিতে থাকেন। সহসা রাশিয়ায় যাবার আকর্ষণ বোধ করলেন বারলাখ। দক্ষিণ রাশিয়ার গথিক ভাস্কর্য ও লোকশিল্পের দ্বারা তিনি বিশেষভাবে প্রভাবিত হলেন। কাঠের কাজই বারলাখ করেছেন বেশি এবং তাতেই তাঁর দক্ষতার পরিচয়ও বেশি মিলেছে। তবে গ্রাফিক শিল্পী হিসেবেও তিনি যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯১০ সাল থেকে তিনি উত্তর প্রুশিয়ার গুস্ত্রফে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে থাকেন এবং বিশ শতকে তিনি গুস্ত্রফ, কিয়েল এবং মাগদেবুর্গে অনেকগুলো

একটি মনুষ্য মূর্তি :
আর্নস্ট বার্লাখ
এই ভাস্কর্যের নির্মাতা।

স্মৃতি-মূর্তি নির্মাণ করে প্রভূত যশের অধিকারী হন। 'অসি নিষ্কাশনকারী মানুষ' (১৯১১) তাঁর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। এটি একটি কাঠের কাজ, দৈর্ঘ্যে একত্রিশ ইঞ্চি। ক্যানব্রুক আকাদেমি অব আর্ট-এর সংগ্রহশালায় বারলখের তৈরি এই কাঠের মানুষটি বিশেষ সম্মানের স্থান পেয়েছে। কুর্ট ভেলেণ্টিন গ্যালারিতে রক্ষিত তাঁর নির্মিত আরেকটি কাঠের মানুষ সাড়ে ছাব্বিশ ইঞ্চি উঁচু 'ম্যান ইন দি স্টকস'ও এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই মহৎ শিল্পী ১৯৩৮ সালে পরলোকগমন করেছেন।

হামবুর্গের আর যে খ্যাতিমান ভাস্করের কথা আমি এখানে বলবো তিনি সম্পূর্ণই একালের, এখনো তাঁর প্রৌঢ়ত্বের সীমা পেরোয়নি। ১৯০৮ সালে হামবুর্গ শহরেই তাঁর জন্ম। একুশ বছর বয়সে তিনি প্যারিতে চলে যান এবং সেখানে তিন বছর শিল্প-চর্চায় অতিবাহিত করে ইতালীয় ভাস্কর্যের রূপরেখা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের জন্যে ১৯৩২ সালে তিনি চলে যান ফ্লোরেন্সে। সেখানে প্রায় বছর দুই থেকে ভাস্কর কার্ল হারতুঙ্ যখন হামবুর্গে ফিরে এলেন তখন তিনি শিল্পী হিসেবে সুপরিচিত। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি হামবুর্গেই কাটিয়েছেন। তারপর তাঁর ডাক এসেছে দেশের এপ্রান্ত-ওপ্রান্ত থেকে। ১৯৫০ সাল থেকে কার্ল হারতুঙ্ বের্লিনের হখ্শুলে ফ্যুর বিলদেন্দে কুনস্তের সংগে ভাস্কর্য শিল্পের অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত আছেন। তাঁর তৈরি ব্রোঞ্জের একটি মূর্তি (ফিগার —১৯৫০) হারতুঙ্-এর শিল্প-শৈলীর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। পঞ্চান্ন ইঞ্চি দীর্ঘ এই মূর্তিটি শিল্পী তাঁর নিজের কাছেই রেখেছেন।

আরেকজন ভাস্কর হেরমান ব্লুমেন্তাল ঠিক হামবুর্গের নাগরিক না হলেও তাঁরই নামে তিনি একটি এস্টেট প্রতিষ্ঠা করে গেছেন হামবুর্গ শহরে এবং সেই এস্টেটে তাঁর স্মৃতি বহন করছে তাঁর সৃষ্টি 'ম্যান সিটিং অন এ স্ট্যাম্প' ব্লুমেন্তাল ১৯৩১-৩২ সালে সাড়ে একচল্লিশ ইঞ্চির এই মূর্তিটি নির্মাণ করেন। ১৯০৫ সালে ব্লুমেন্তালের জন্ম। তাঁর শিল্পশিক্ষা বের্লিন আকাদেমিতে। ১৯২৫ থেকে ছ'বছর কাল ছাত্র জীবনের পর বের্লিনেই তিনি অনেক দিন পর্যন্ত পাথরের কাজ নিয়ে মগ্ন থাকেন। তারপর শুরু হয় তাঁর বিদেশ ভ্রমণের পালা। ইতালীতেই যান তিনি তিন তিনবার এবং ১৯৩৬ সালে তিনি শেষবারের মতো ইতালি ঘুরে আসেন। মাত্র ৩৭ বৎসর বয়সে ভাস্কর হেরমান ব্লুমেন্তালের জীবনদীপ নির্বাপিত হয়।

আরেকজন সমকালীন তরুণতর শিল্পী বেরনার্দ হেইলিগের। এই তরুণ ভাস্কর ১৯১৫ সালে পূর্ব জার্মানীর অন্তর্গত স্তেতিনে জন্মগ্রহণ করলেও স্তেতিনের বের্কশুলে ১৯৩১-৩৪ সাল পর্যন্ত কলা-শিল্পের প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণের পরেই তিনি বের্লিনে আসবার জন্যে উন্মুখ হয়ে ওঠেন। বের্লিন আকাদেমিতে ভর্তি হয়ে তিনি সেখানে ভাস্কর্যের শিক্ষা সমাপ্ত করেন। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত প্রায় একটানাই তিনি বের্লিনে তাঁর শিল্প সাধনায় নিমগ্ন থাকেন। শিল্প-কর্মে দক্ষতার জন্যে ১৯৪৯ সালে বেরনার্দ হেইলিগেরকে বের্লিনের হখ্শুলে ফ্যুর বিলদেন্দে কুনস্তে ভাস্কর্যের অধ্যাপক নিযুক্ত করা হয়। প্রায় পঁচিশ ইঞ্চি দীর্ঘ তাঁর সিমেন্টের তৈরি 'সেরাফ্' (১৯৫০) নামাঙ্কিত শ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় দূতের মূর্তিখানি শিল্পী তাঁর নিজের অধিকারেই রেখেছেন।

এ পর্যন্ত যে সমস্ত ভাস্কর্য-শিল্পীকে নিয়ে আলোচনা করা হলো তাতে দেখা গেল যে তাঁদের প্রায় প্রত্যেকেই আত্মবিকাশের ক্ষেত্র হিসেবে বের্লিনকে

বেছে নিয়েছিলেন। তাই স্বাভাবিক। কারণ বের্লিন জার্মানীর প্রাণকেন্দ্র, বের্লিনের মাধ্যমেই জার্মানীর পরিচয়। যুদ্ধোত্তর কালে গোটা জার্মানী এবং বের্লিন দ্বিধা বিভক্ত হওয়া সত্ত্বেও জার্মাণ জাতির সাংস্কৃতিক জীবনে এই মহানগরীর গুরুত্ব হ্রাস পায়নি। এখানে তাই বের্লিনের অন্ততঃ দুজন প্রতিনিধি স্থানীয় ভাস্করকে নিয়ে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক হবে বলে মনে করছি।

এখানে বলে রাখা দরকার যে অধিকাংশ জার্মাণ ভাস্করই ঐতিহ্যবাদী এবং রক্ষণশীল। ফ্রান্স এবং মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে শিল্পজগতে বিশেষ করে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে ক্রমাগত যে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলে আসছে জার্মানীতে তেমনটি প্রত্যাশা করা ঠিক নয়। অবশ্য দেশ বিভাগের পর জার্মানীর দুই অংশে দুটি শিল্প রীতি সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পৃথক সমাজ-ব্যবস্থা ও পৃথক জীবন-দর্শনের প্রভাব শিল্পীর চিন্তাকে পৃথক-ভাবে প্রভাবিত করবেই। নাৎসী যুগের নিষ্ঠুরতা ও যুদ্ধকালীন অত্যাচারের বেদনা আজও যেমন জীবন্ত বাস্তবতায় রূপায়িত হয়ে চলেছে পূর্ব জার্মানীর মূর্তিশিল্পে, যুদ্ধ-বিরোধিতায় বা সমাজতন্ত্রের জয়-বার্তা ঘোষণায় পূর্ব জার্মাণ ভাস্করেরা যতটা মুখর তাঁদের শিল্পকর্মে সেই নবনীতির কোনো লক্ষণ চোখে পড়ে না পশ্চিম জার্মানীতে। তবে বিদেশী প্রভাবমুক্ত 'খাঁটি জার্মাণ শিল্প গড়ে তোলার কাজে' চিত্রশিল্পে যেমন উইলি বমিস্টার, ফ্রিজ উইণ্টার, ওয়ার্নার জাইলস প্রভৃতি অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন, ভাস্কর্যেও তেমনি যদি কয়েকজনের নাম করতে হয় তাহলে গের-হার্ড মার্কস্, হানস্ উহ্লমান প্রভৃতির কথা স্বভাবতই এসে পড়বে।

আজকের পশ্চিম জার্মানীতে ভাস্কর গেরহার্ড মার্কস-এর শিল্পকর্মই বোধহয় সর্বাধিক আলোচিত। এওয়াল্ড মাতারের মতো গ্রাফিক শিল্পেও তিনি বিশেষ পার-দর্শী। এক্সপ্রেসনিজম্-এর দিকে তাঁদের দুজনেরই খুব ঝোঁক, তবে তাঁদের প্রত্যেকটি কাজেই শেষপর্যন্ত নিজ নিজ বক্তব্যটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে। গেরহার্ড মার্কস বের্লিনেই জন্মগ্রহণ করেন ১৮৮৯ সালে। প্রথম জীবনে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বয়োবৃদ্ধ ভাস্কর রিখার্ড শাইবের স্টুডিওতে ১৯০৭ সাল থেকে বেশ কিছুকাল তিনি শিল্পশিক্ষা করেন। ১৯২০-২৫ সাল পর্যন্ত ডিরেক্টর অব সিরামিকস হিসেবে চলে তাঁর সরকারী কর্মজীবন। গ্রীস, ইতালি ও ফ্রান্স পরিভ্রমণে তিনি সেইসব দেশের ভাস্কর্যের ও অন্যান্য শিল্প-শাখার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে সম্যক ও প্রত্যক্ষ উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতা অর্জনে লাভবান হন, কিন্তু স্বকীয়তাকে

পশ্চিম জার্মানীর ভাস্কর গেরহার্ড-কৃত ভাস্কর্যের নিদর্শন।

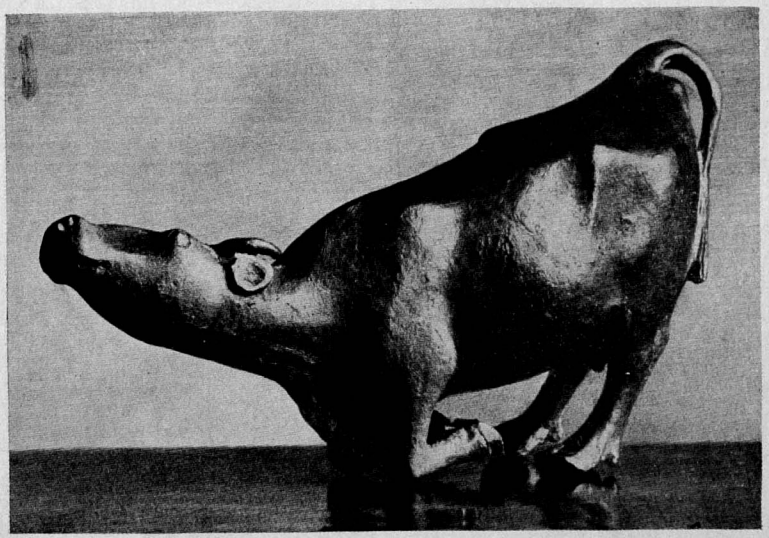

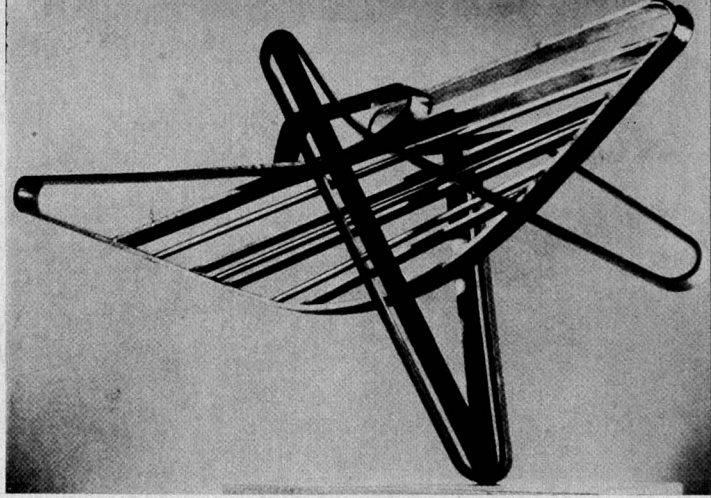

ডানদিকের পাতায়
ভাস্কর্যটির রূপকার
পশ্চিম জার্মানীর ভাস্কর
হান্স উহ্লমান।

কখনো বিসর্জন দেন না। ১৯৩৩ সাল থেকে বর্তমানে পূর্ব জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত মেকলেনবুর্গে স্থায়ীভাবে বসবাস আরম্ভ করলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসানে দুই জার্মানীর মধ্যবর্তী সীমান্ত পেরিয়ে এসে হামবুর্গে ১৯৪৬ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত শিল্প-শিক্ষা দানে নিযুক্ত থাকেন। অনেক বড়ো বড়ো কাজের জন্যে একের পর এক ডাক আসতে থাকে তাঁর কাছে—হামবুর্গ থেকে, লুবেক থেকে, কোলোন থেকে। বর্তমানে তিনি কোলোনেই বসবাস করছেন। তাঁর বিখ্যাত শিল্পকর্ম ব্রোঞ্জের পঁচিশ ইঞ্চি উঁচু মূর্তি 'সিটেড গার্ল' বা বসা মেয়ে গেরহার্ড মার্কস নির্মাণ করেন ১৯৩২ সালে।

হান্স উহ্লমান সম্বন্ধে শুধু এটুকুই বলবো, ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে যাঁর কর্মজীবন শুরু ১৯২৫ সালে পঁচিশ বছর বয়সে হঠাৎ ভাস্কর হিসেবে তাঁর আত্ম-প্রকাশে গভীর বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়েছিল জার্মাণ শিল্পী মহলে। তাঁর ভাস্কর্যে আধুনিক চিন্তার লক্ষণ যেমন সুস্পষ্ট তাতে তেমনি লক্ষ্য করা যায় একজন সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের নিখুঁত কুশলতা। ১৯২৯ সালে তিনি ফ্রান্স সফরে যান। কিন্তু তাঁর শিল্প চিন্তাকে ফরাসী ভাব বা আঙ্গিকের দ্বারা তিনি প্রভাবিত হতে দেন নি। ১৯৫০ সালে তিনি অধ্যাপক হিকেবে বের্লিন আকাদেমিতে যোগদান করেন এবং সেই থেকে তিনি বের্লিনেই আছেন। ১৯৫১ সালে তাঁর তৈরি ছয় ফুট ফুট পৌনে সাত ফুটের বিরাট লোহাবয়ব 'ফিগারেশন' উহ্লমানের নিজের স্টুডিওতেই সংরক্ষিত আছে।

প্রবন্ধ শেষ করবার আগে বর্তমান জার্মাণীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর মাক্স আর্নস্ট সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা না করলেই নয়। কারণ তিনি শুধু ভাস্কর নন, প্রকৃতপক্ষে তিনি সব্যসাচী। তিনি কবি, চিত্রশিল্পী, সমালোচক এবং সম্পাদকও। আধুনিক কাব্য ও শিল্প আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়েছেন। ১৮৯১ সালে ২রা এপ্রিল কোলোন শহরের অদূরবর্তী এক পল্লীতে তাঁর জন্ম। উনিশ বছর বয়সে মাক্স আর্নস্ট বন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন শিল্প বিদ্যায় পারদর্শী হবার জন্যে। ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল অবধি তিনি শিল্পকর্মে গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট থাকেন। তারপর তাঁকে দেখা যায় ১৯১৯ সালে তাঁর শিল্পীবন্ধু বারগেল্ডের সঙ্গে কোলোনে 'ডাডা' আন্দোলনে মেতে উঠতে। বাস্তবিক পক্ষে তিনি তাঁর দলবল নিয়ে জার্মানীর গতানুগতিক শিল্প-ধারণার ওপর প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিলেন। যাহোক কোলোনে 'ডাডা' আন্দোলন পরিচালনা কালে মাক্স আর্নস্ট 'দি ষাম্নাদ' এবং তারপরে 'দের ভেন্তিলাতর্' নামক সাহিত্য-শিল্প- পত্রিকা দুটি সম্পাদনা করেন। ১৯২১ সালে তাইরোলে তাঁর জীবনে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। ত্রিস্তাঁংজারা প্রবর্তিত 'ডাডা' মতবাদ থেকে তাঁকে সে সময় মোহমুক্ত করতে সাহায্য করেন কবি পল এলুয়ার। আঁদ্রে ব্রঁত এবং শিল্পী আর্প। মাক্স অতঃপর সুররিয়ালিস্ট মতবাদে শুধুমাত্র আস্থা জ্ঞাপনই করলেন না, তিনি প্যারিতে সুররিয়ালিস্ট আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টারূপেও পরিচিত হলেন। এর পরের ঘটনাবলী আরো ছোট্ট করে বলা চলে। মাক্স আর্নস্ট পল এলুয়ার প্রমুখ কবিদের কবিতার বই-ই শুধু সুশোভিত করেন নি, তিনি নিজের কবিতার বই এবং শিল্পের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনীও করেছিলেন। মাক্স আর্নস্ট-এর প্রতিভার প্রথম সমাদর হয় ফ্রান্সেই। ১৯৩৩ সালে নাৎসী জার্মাণী তাঁকে 'ডিকাডেন্ট' হিসেবে বর্জন করেছিল। তারপরের বছরেই প্যারিতে তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ 'সেমেন দে বোঁতে' প্রকাশিত হয় এবং সে সময়েই তিনি মালোজায় জিয়াকোমেত্তির উদ্যানে অপূর্ব ভাস্কর্যমণ্ডিত অনেকগুলো পাথর-খোদাই মূর্তি নির্মাণ করে অশেষ খ্যাতির অধিকারী হন। একই সময়ে করসো বারে তাঁর সদ্যসমাপ্ত মুর্যাল চিত্রকলা সমাগত বিদেশীদের মুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৩৭ সালে ফ্রান্সের বিখ্যাত শিল্প-পত্রিকা 'কাইয়ে দ্য আর্ট'-এর একটি বিশেষ সংখ্যায় আর্নস্টের শিল্প-প্রতিভার বিভিন্ন দিক নিয়ে দিকপাল শিল্পীদের আলোচনা স্থান পায়। একি বড়ো কম কথা? হামবুর্গে এবং জার্মানীর অন্যান্য অনেক বড়ো বড়ো শহরে তাঁর শিল্প-প্রদর্শনী যোগ্য সম্মান পেয়েছে পরবর্তী কালে। শিল্প-কৃতির জন্যে তিনি আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন ১৯৫৪ সালে। দীর্ঘকাল ধরে বেশির ভাগ সময় তিনি প্যারিতেই থাকছেন।

উপসংহারে রেনে সিন্টেনিসের নামোল্লেখ করতে হয় প্লাস্টিকের কাজে জীব-জন্তু রূপায়ণে তাঁর অপূর্ব দক্ষতার জন্যে। বিস্তারিত না হলেও এই থেকেই পশ্চিম জার্মানীর সমকালীন ভাস্কর্যের মোটামুটি একটা ধারণা করা যাবে বলে আশা করি।

গুস্তাভ্ ভিগেলাণ্ড

চিন্তামনি কর

বাংলার অগ্রগণ্য ভাস্করদের মধ্যে এক-জন। য়ুরোপের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় এঁর বিশিষ্ট শিল্প-কর্মগুলি শোভা পাচ্ছে। কোলকাতার গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজ-এর অধ্যক্ষ। লেখক হিসাবেও সুখ্যাত। 'সান্নিধ্য' নামক গ্রন্থটি উল্লেখ্য।

নরওয়ের বিখ্যাত ভাস্কর গুস্তাভ্ ভিগেলাণ্ডকে তাঁর দেশবাসী ও সরকার যে সম্মান ও সমাদর দেখিয়েছেন তা প্রাচীন এথেন্স-এর বিশ্ববিশ্রুত ভাস্কর ফাইদিয়াস্-এর জনপ্রিয়তার সঙ্গে তুলনীয়।

ভিগেলাণ্ড-এর জন্ম হয়েছিল আজ থেকে তিরানব্বই বছর আগে এক অখ্যাত চাষী পরিবারে। ছুতারের কাজ ছিল তাঁদের বংশগত পেশা। বছর তেরো বয়েসেই গুস্তাভ্কে বিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষা ছেড়ে দিয়ে বাটালি, হাতুড়ি নিয়ে রোজগারের পথ দেখতে হয়েছিল। তাঁর বয়েস যখন ষোল, পুত্রের কাজের ধরণধারণ দেখে তাঁর পিতার মনে হল যে গুস্তাভ্ ছুতারের কাজের চেয়ে আরো অন্য কিছু বড় রকমের কারিগরিতে উন্নতি করতে পারবে। তাই তিনি কিছু আসবাবপত্র এক ঠেলাগাড়ীতে বোঝাই করে গুস্তাভ্কে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন অস্লো শহরে এবং সেই আসবাবের

মা ও ছেলে : গুস্তাভ্ ভিগেলাণ্ড-কৃত একটি মূর্তি।

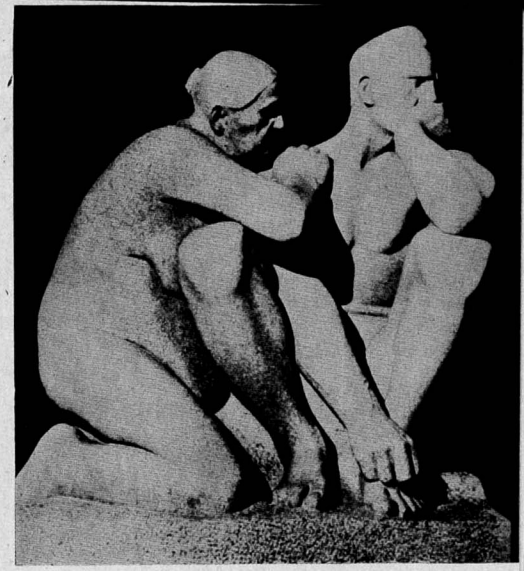

মাতা কর্তৃক পুত্রকে সহানুভূতি জ্ঞাপন : এই আবেগপূর্ণ অনবদ্য ভাস্কর্যটির রূপকার বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর ভিগেলাণ্ড।

বিকয়লব্ধ অর্থে ছেলেকে এক মূর্তিকারের কাছে শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থা করে দিলেন। কিন্তু এই সামান্য পুঁজি শীঘ্রই নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় অন্নসংস্থানের জন্য গুস্তাভ্ জাহাজের কাজ নিয়ে দেশদেশান্তরে ঘুরে বেড়ালেন কয়েক বৎসর। তারপর আবার ফিরে এলেন অস্লোতে এবং আমৃত্যু এই শহরে থেকে ভাস্কর হিসাবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে রেখে গেলেন তাঁর ভাস্কর্য রচনাবলীর এক বিরাট স্মৃতিসংগ্রহ।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে অস্লো শহরের কর্তৃপক্ষ ফ্রগ্নে পার্ক-এর এক অংশ ভাস্কর্যে অলঙ্কৃত করবার জন্য ভিগেলাণ্ডকে ছেড়ে দেন এবং যাতে করে পার্কটি ভাস্কর্যে ভরিয়ে দেওয়া যেতে পারে তার জন্য যথেষ্ট অর্থেরও ব্যবস্থা করে দেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-কালীন এক ব্যক্তির করা ভাস্কর্যের এই বিরাট সমারোহ সম্পূর্ণ হয়। পার্কের দুটি অংশের মাঝ দিয়ে যে জলস্রোত প্রবাহিত তার উপরে একটি সেতু নির্মাণ করে তার দুধারে ভিগেলাণ্ড-কৃত বহু ক্রীড়ারত মূর্তির অভিনব পরিকল্পনাগুলিকে বসান হয়েছে। পার্কের কেন্দ্রস্থলে একটি ভাস্কর্যপূর্ণ দ্বীপের সৃষ্টি করে ভিগেলাণ্ড তার মাঝখানে স্থাপন করেছেন ষাট ফুট উঁচু একখণ্ড বিরাট গ্রেনাইট পাথরে খোদা তাঁর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রচনাকে। এই ভাস্কর্য সম্বলিত বিরাট স্তম্ভে প্রায় একশোটি নরনারীর নগ্নমূর্তি নানান ভঙ্গিতে পরস্পরের সঙ্গে শৃংখলিত।

গুস্তাভ্ ভিগেলাণ্ড-এর মত ভাস্করের আবির্ভাব এই শতাব্দীর এক অভূতপূর্ব ঘটনা বলা যেতে পারে। তিনি কোন বিশেষ ভাস্কর বা ভাস্কর্যের স্কুলে শিক্ষালাভ করেন নি অথবা কোন বিশিষ্ট ভাস্কর্য রীতি বা ধারার সঙ্গে তাঁর রচনাকে কোনমতে জড়িত করা যায় না। স্বীয় আয়াসে ভাস্কর্য কলাকৌশলে শিক্ষিত ভিগেলাণ্ড তাঁর রচনায় এক বলিষ্ঠ স্বাতন্ত্র্যের ছাপ পরিস্ফুট করেছেন যার একমাত্র পরিচয় হচ্ছে 'ভিগেলাণ্ড-এর সৃষ্টি'। বাইবেল হোমার এবং দান্তের ইনফারনো ছিল তাঁর প্রথম জীবনের রচনার বিষয়বস্তু। কিন্তু পরে শরীরধর্মী দৃষ্টি দিয়ে মানবজীবনের নানা আবেগকে তিনি অভিব্যক্ত করেছেন পাথরের নানা মূর্তির অবতারণায়। তাঁর রচনা বৈশিষ্ট্যে আকৃষ্ট হওয়ায় তাঁকে সরকারী ও বেসরকারী নানা বৃত্তি দেওয়া হয়েছিল যাতে করে তিনি অন্যান্য দেশের শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য অনুশীলন করতে পারেন। কিন্তু নানা দেশ পর্যটন ও নানা শিল্পের অনুশীলন সত্ত্বেও মনে প্রাণে তিনি রয়ে গিয়েছিলেন অপরিবর্তিত গোঁড়া নরওয়েজিয়ান। এবং স্বজাতির শারীরিক বলিষ্ঠতা ও গর্ব স্বদম্ভে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর প্রত্যেকটি রচনায়। তাঁর সৃষ্টির সার্থকতা ও মান নিয়ে তাঁর স্বদেশ এবং বিদেশের বিদগ্ধমহলে আজও নানা তর্কবিতর্ক চলছে এবং চলবে। অবশ্য তাঁর অদ্ভুত সৃজন ক্ষমতা ও অপরিসীম কর্মনিষ্ঠা সম্বন্ধে কারুরই মতভেদ দেখা যায় না। ভাস্কর্যের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় ভিগেলাণ্ডকে কোন ধারা বা ঐতিহ্যের অধ্যায়ে সাজান চলে না। খাপছাড়া, অতিশয় স্বতন্ত্র ধর্মী এক মহাশক্তিমান ভাস্কর হিসাবে তাঁর স্থান শিল্প ইতিহাসে অক্ষুন্ন থাকবে যদিচ তাঁর সকল রচনা বলিষ্ঠভাবের দ্যোতনা দিলেও ভাস্কর্যের মান হিসাবে তার সবগুলিকে উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি বলা যাবে না। ভিগেলাণ্ড-এর ভাস্কর্য অস্লোর ফ্রগ্নে পার্ক ছাড়া আর কোথাও অন্য সংগ্রহে নেই এবং শুধু ফটোগ্রাফ্ থেকে তাঁর ভাস্কর্যের সঠিক রসগ্রহণ করা দুরূহ।

ভাস্করের নিজের ধারনায় স্বীয় রচনার যেটিকে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের প্রতিষ্ঠা দিতে মনস্থ করেন বাস্তবে কালের দেওয়া প্রতিষ্ঠায় অনেক ক্ষেত্রে স্রষ্টার দেওয়া

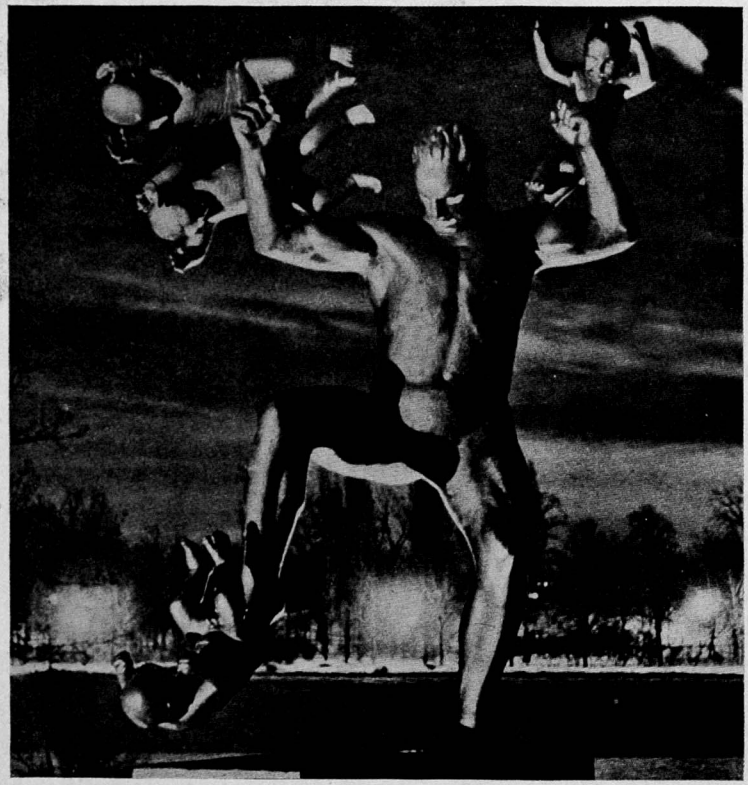

অসলোর ফ্রগ্‌নে পার্কে অবস্থিত মূর্তিগুলির মধ্যে এই মূর্তির লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। একটি পূর্ণায়ত মানুষের হাতে ও পায়ে শিশুদের অবস্থান ভঙ্গিমা মূর্তিটিকে 'গ্রোটেস্ক্'—এই আখ্যা দান কোরেছে।

সেই মান রক্ষা সম্ভব হয় না। রোদ্যাঁ তাঁর সব রচনার চেয়ে 'পোর্ত দাঁফেয়ার' অর্থাৎ 'নরকের দ্বার'কে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর অপরাপর বিরাট রচনার কাছে এর স্ফুরণকে অতিশয় নিষ্প্রভ দেখায়। এই রচনায় ভাস্কর্যের শক্তি ও প্রাণ হারিয়ে গিয়ে চিন্তার আমেজেই 'পোর্ত দাঁফেয়ার'কে এক দুর্বল সৃষ্টিতে পরিণত করেছে। ভিগেলাণ্ড-এর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা ষাট ফুট গ্রেনাইট-এর বিরাট মনোলিথ্ দেখে মনে হয় তাঁর অন্যান্য রচনার তুলনায় এটি সর্বোৎকৃষ্ট নয় যদিও এর মধ্যে অংশবিশেষে মূর্তিগুলিকে আলাদাভাবে দেখলে বিরাট ভাস্কর্যের ব্যঞ্জনাকে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। সমগ্রভাবে এই ভাস্কর্যমণ্ডিত স্তম্ভটিকে দেখে মনে হয় যেন কারুকার্যময় হস্তীদন্তের এক রচনাকে বহুগুণে বড় করে গ্রেনাইট-এ খোদাই করা হয়েছে এবং আয়তনে বিরাট হলেও এর আদি পরিকল্পনার প্রভাবমুক্ত হতে পারেনি। ভিগেলাণ্ড সম্বন্ধে বহুমত প্রসূত হওয়ায় হয়ত মনোলিথ্‌টি সম্বন্ধে আমার এই মত-গ্রহণে অনেকে নারাজ হবেন, কিন্তু ফ্রগ্‌নে পার্কে ভিগেলাণ্ড-এর ভাস্কর্যাবলীর জনতায় তাঁর বহু রচনায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর শক্তিমান প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে যখন শিল্পীর চোদ্দ বছরের নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রমের ফল এই বিরাট গ্রেনাইট-এর সামনে দাঁড়িয়েছিলাম তখন মনে প্রশ্ন জেগেছিল যে মৃত্যুর ঠিক পূর্বে (১৯৪৩) ভিগেলাণ্ড তাঁর জীবনের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী ও বিরাট ভাস্কর্য পরিকল্পনার সমাপ্তিতে সর্বশ্রেষ্ঠ রচনার পরিপূর্ণতা দেখতে পেয়েছিলেন কিনা!

অমূর্ত আকাঙ্ক্ষা

দরবেশ

উপরোক্ত ছদ্মনামে দিল্লীপ্রবাসী জনৈক সাংবাদিক। পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধাদি রচনা কোরে বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ কোরেছেন। এই প্রবন্ধ ২৮শে পৌষ, ১৩৬৮ তারিখে প্রকাশিত সাপ্তাহিক 'দেশ' থেকে পুনরায় মুদ্রিত। লেখাটি ভালো হওয়া ছাড়াও প্রতীচ্যের ভাস্কর্য সম্পর্কে দেশগুলির পারম্পর্য রক্ষার জন্যেও এই পুনর্মুদ্রণ।

হাইড পার্ক নয়, ভাইগল্যান্ড পার্ক। লন্ডনের হাইড পার্কে সব সময়েই জনতার সমাগম। কেউ বা আসেন বেড়াতে, কেউ বক্তৃতা দিতে, আবার কেউ আসেন চেয়ার টেনে নিয়ে বসে খবরের কাগজে চোখ বুলোতে অথবা দিবানিদ্রাসুখ উপভোগ করতে। অসলোর ভাইগল্যান্ড পার্কে যাঁরা আসেন তাঁরা কিন্তু নিছকই দর্শক—জীবনের দর্শক। তাঁরা এখানে কোনো নৈসর্গিক শোভা দর্শনাভিলাষে আসেন না, আসেন শুধুমাত্র জীবনের দর্শক হয়ে দেখেন অনন্যসাধারণ শত-শত মর্মরমূর্তির এক অপূর্ব সমাবেশ যার জন্যই এই পার্কটি নির্মিত।

দর্শক এখানে প্রস্তরে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলি দেখেন; আর ভাগ্য যদি সুপ্রসন্ন হয় হয়ত কদাচিৎ অভূতপূর্ব অবোধ্য একটি সঙ্গীতের প্রতিধ্বনি শোনেন। এমন একটি পার্ক সুমেরুবৃত্তের স্বপ্নময় ছায়ায় না হয়ে অন্য কোথাও কল্পনা করা ভাবনাতীত। বর্তমানের অসুস্থ জগতে এ এক বিস্ময়কর পার্ক। অবাক হতে হয়, খানিকটা কোনার্ক, খানিকটা খাজুরাহো, কিন্তু সব মিলিয়ে নিঃসন্দেহে আধুনিক ভাস্কর্যের একটি অমরাবতী। সাধারণ মানুষের কাছে এই অমরাবতী কল্পনাতীত।

স্বদেশীয় ছিদ্রান্বেষীদের কটাক্ষ, 'অপ্রকৃতিস্থ' অপবাদ, ভাস্কর গুস্তাভ্ ভাইগল্যান্ডকে দিকভ্রান্ত করতে পারেনি। শিল্পীজীবনের সুদীর্ঘ আটচল্লিশ বছর এই শিল্পী তাঁর অমরাবতীর পরিকল্পনায় ও রূপায়ণে বিনা পারিশ্রমিকে আত্মোৎসর্গ করেছেন। সরকারের মুখাপেক্ষী না হয়ে দেশের শিল্পপতিরা তাঁকে অর্থ যুগিয়েছেন তাঁর শিল্পসাধনাকে মূর্ত করে তুলতে।

১৯৪৩ সনে পার্কটি যখন গড়ে উঠল এবং ভাস্কর তাঁর জীবনের সেরা ও সবচেয়ে অদ্ভুত সৃষ্টি—'জীবনের দর্শন'—রচনা করলেন, সহসা তখনই চিরদিনের জন্য যুদ্ধবিধ্বস্ত বিকৃত পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন তিনি। হাইড পার্ক ভুবনবিখ্যাত; কার্জন পার্ক তো আমাদেরই সুপরিচিত, কিন্তু ভাইগল্যান্ড পার্ক শুধু কী শিল্প-রসিকদেরই ভূস্বর্গ? কিন্তু এবার আমার নিজের অভিজ্ঞতায় আসা যাক।

(এক)

ক'দিন ধরে এই মূর্তিগুলো নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। শুতে বসতে বেড়াতে এরা আমায় সব সময় ভাবিয়ে তুলেছে। মূর্তিগুলোতে পদে-পদে অভিনবত্বের চমক আছে, কিন্তু আরো এমন কিছু আছে যা মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। অত্যদ্ভুত শিল্পদক্ষতা! কিন্তু তাও তো আমায় ঠিক ভাবিয়ে তুলছে না!

আজও সকাল থেকেই অভ্যাসমতন আমি পার্কে পরিক্রমা দিয়েছি। কোথায় এসেছি তাও যেন ধারণার বাইরে। বেঞ্চিতে একা বসে মনে হোচ্ছে আমার চারি-পাশে অশরীরী কারা যেন ব্যালের ভঙ্গীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মধ্যে মধ্যে ওরা যেন আমায় বলছে, চিনতে পারছ না আমরা কে?

এখানে এলেই আমার মনে অবর্ণনীয় সুখের এমন একটি প্রবাহ ব'য়ে যায় যার মানে আমি আজও জানিনে। তবু কেমন যেন অকারণেই ভয় করে, আবার এত ভালোও লাগে যেন গোপনে কোনো উর্বশীর অভিসারে এসেছি যা নীতিবিরুদ্ধ। কিন্তু কেন?

বাল্টিক সাগরের খামখেয়ালী শীতল বাতাসে এমনিতেই মনের মধ্যে শিহরণ দেয়। তদুপরি আছে কমলালেবু রঙের সূর্য, যার উত্তাপ রোমাঞ্চকর! কিন্তু এ তো শুধু সূর্যের তাপ নয়, দিবাকরের আলোও নয়! এ হচ্ছে সেই মূর্তিগুলির উত্তাপ—ওদের দিকে না তাকালেও আমি উপলব্ধি করতে পারি ওরা আছে। আছে আমার মনের মধ্যে, আমার চারপাশে, আমার চেতনায়।

মেরুপ্রান্তের যে দেশে সূর্যের এতটুকু উত্তাপের জন্য মানুষ আকাশের দিকে অষ্টপ্রহর তাকিয়ে থাকে সেই দেশেই বুঝি ভাইগল্যান্ড পার্কের সৃষ্টি সম্ভব। মূর্তিগুলোকে বাদ দিলে তো এ পার্ক শুধুই একটা ফাঁকা হাহাকার, স্বপ্নহীন নিঃসঙ্গ হৃদয়।

যতদূর দৃষ্টি যায় শুধুই অনাবৃত নরনারীর মর্মর-মূর্তি; স্বপ্নের মধ্যে আমার বুদ্ধির অতীত এমন একটা স্বর্গ যেখানে শুধু একটানা অক্লান্ত একটি কবিতা, যে কবিতার আদি নেই, অন্ত নেই, মাঝপথেই ঝুলে রয়েছে আকাশের চাঁদের মত। এ অসম্ভব।

তবু এও তো সম্ভব!

বেঞ্চির উপর ওভারকোট জড়িয়ে বসেছিলাম, টুপিটা চোখের উপর থেকে সরিয়ে তুষারবিন্দুগুলো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ভাবলুম, অনেকবার তো দেখেছি, এখন আর নাই বা তাকালুম! তবু চলতি বাসে সৌন্দর্য যখন পাশে বসে আপন সৌরভ ছড়ায় তা যেমন না দেখে পারিনে তেমনই আবার আমি উল্টে মূর্তিগুলির দিকে অসহায়ভাবে তাকালুম।

পাথরে গড়া একটি শিশু মাটিতে শুয়ে যেন শূন্যে

ঝুলছে—বিস্ময়কর সৃষ্টি! বাতাসে একটি ঘূর্ণমান নারী। শিশুটি বুঝি মাকে স্বপ্ন দেখছে বিভোর হয়ে, আর দু'ধার দিয়ে চলে গেছে দিগ্বলয়ের দিকে পূর্ণাবয়ব নরনারীর অসংখ্য প্রতিমূর্তি। এ এক অপূর্ব রসাভিসার।

যেদিকে তাকাই সেদিকেই শুধু নগ্ন নরনারীর মর্মর-মূর্তি—অশেষ, অনবদ্য।

পূর্ণাবয়ব মূর্তিগুলি নানা ভঙ্গীতে বিরাট পার্কের চারিদিকে এমনভাবে সাজানো, মনে হয় সৃষ্টিকর্তার গবেষণাগারে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আলোচনা চলেছে মানুষ নিয়ে, মানুষের মন আর তার চিন্তা নিয়ে। এ যেন একটা অনাবিষ্কৃত দর্শনের মর্মর প্রতিচ্ছায়া।

গ্র্যানাইট প্রস্তরে তৈরী একটি গাছ। দুটি শাখা। গাছের নীচে দুটি ডালের দু' পাশে একটি নর ও একটি নারীর প্রতিমূর্তি। ওদের পরস্পরের মাথা স্পর্শ করে রয়েছে। মেয়েটির ডান হাতটি পুরুষের প্রশস্ত বক্ষে। পুরুষটির বাঁ হাত গাছের ডালে, অন্য হাতটি মেয়েটির কমনীয় কাঁধে। দু'জনের চোখ দু'জনকে এমনভাবে দেখছে মনে হয় যেন ওরা অন্তহীন আবিষ্কারের আবেগে মন্ত্রমুগ্ধ, মুহ্যমান।

আরো দূরে অন্য আর একটি গাছের শাখায় যেন শূন্যে উবুড় হয়ে শুয়ে একটি কিশোর অধীর আগ্রহে নিচের মূর্তিগুলিকে দেখছে। আর, অদূরেই ঝরনার নীচে কতকগুলি প্রতিকৃতি প্রকাণ্ড একটি জলাধার ধারণ করে রয়েছে ওদের কাঁধের উপর।

এখনো সন্ধ্যা হতে বিলম্ব আছে। মাত্র সাতটা বেজেছে। ঝরনার নিচের মূর্তিগুলি আগেও আমি দেখেছি। আজও তার ধারে গিয়ে দাঁড়ালাম। ভারী জলাধারের নিচে মূর্তিগুলির চোখমুখের প্রতিক্রিয়া একের থেকে অন্যের আলাদা।

দুটি মূর্তির চোখমুখের ভঙ্গী দেখে মনে হয় ওরা জলাধারটিকে ধরে রাখবার জন্য পরস্পরকে সাহায্য করছে। অন্য আর একটি মূর্তির চোখমুখের রেখা দেখে মনে হয় কাঁধের ভার ও আর সহ্য করতে পারছে না; পড়ো-পড়ো। ও-ধারের তরুণটি (এই আশায় যে অন্যেরা তো ভারটিকে সামলেই রয়েছে) অম্লান বদনে নিজের দায়িত্বে অবহেলা করছে।

মূর্তিগুলির শিল্পসার্থকতা নিঃসন্দেহে দর্শককে অভিভূত করে, মন অবশ করে আনে। ভাবিয়েও তোলে, শিল্পী কিসের প্রতীকের সঙ্গে কার তুলনা করছেন।

একাধিক ঝরনা। অনেকগুলি মূর্তি। আমার দুধারেই জনকয়েক দর্শক ছিলেন; পাশের ভদ্রলোকটিকে সবিনয়ে নিবেদন করলুম—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, এই মূর্তিগুলি কি বলতে চাইছে।

ভদ্রলোক নম্র হেসে কাঁধ ঝাঁকিয়ে এক ঝটকায় আমার নিবেদনটিকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বললেন—আমি নিজেই জানিনে।

অন্য আর একজনের নিকট আমার অজ্ঞতা প্রকাশ করলুম। গলায় হাত বুলিয়ে তিনিও বললেন, ব্রাদার, আমিও কি ছাই কিছু বুঝতে পারছি!

হতাশভাবে আমি আবার নিঃশব্দে মূর্তিগুলো দেখতে লাগলুম। প্রথম ভদ্রলোকটির ডান ধারে আমি ছিলুম। বাঁ ধারে একটি মহিলা। মহিলাটি এগিয়ে এসে শান্তকণ্ঠে বললেন—পারদোন, আমিও সবকিছু বুঝি না, তবু যতটুকু জানি আপনাকে বলতে পারলে খুশী হবো।

ভদ্রমহিলার দিকে মুখ ফিরিয়ে হেসে আমি একটু সরে দাঁড়ালুম, তিনি আমার ঠিক পাশটিতে দাঁড়াবার জায়গা করে নিয়ে সপ্রতিভভাবে স্কুলমাস্টারী সুরে বললেন, ভাইগল্যান্ড দুঃখবাদী ছিলেন না, তবু বর্তমান যুগের তরুণদের সম্বন্ধে হতাশাপীড়িত হয়ে পড়েছিলেন।

কাঁচুমাচু মুখে আমি বললুম, সে কেমন?

ফোয়ারার দিকে তাকিয়ে নির্বিকারভাবে ভদ্রমহিলা বললেন, লক্ষ করুন, যুবকটির চেয়ে ঐ বয়স্ক পুরুষটি ও বৃদ্ধের চোখেমুখে দায়িত্বের ছাপ প্রতিফলিত হয়েছে।

জল, ভদ্রমহিলা এবার একটু হেসে ও সহজ হয়ে বললেন—আপনি নিশ্চয় জানেন, যুগাতীত কাল থেকেই জল উৎপাদনশক্তির প্রতীক, নির্বীর্যের বিপরীত।

ঝরনার জল ও মূর্তিগুলির দিকে আবার আমি মনোনিবেশ করলুম। জল ও মানুষ সম্বন্ধে আমার সুপ্ত ধারণাগুলি স্পষ্টতর হয়ে উঠতে লাগল। পার্কের মধ্যে বেশ বড় রকমের একটি স্বচ্ছ জলাশয় দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জল যে একটি 'রিভাইভ্ইং-ফোর্স' আর গাছ নরওয়েতেও এককালে জীবনের প্রতীকরূপে পূজা ছিল এই পটভূমিকায় শিল্পী ভাইগল্যান্ড তাঁর মনের কিছুটা লাগাম আলগা করেছেন। তাই গাছ ও মানুষ, জল ও মানুষ, এদের প্রতীকরূপে গ্রহণ করেই তিনি তাঁর শিল্পীমনের প্রতিক্রিয়া এখানে সম্ভবত রূপায়িত করতে চেয়েছেন।

আমি লক্ষ করেছি, শিল্পী তাঁর গাছগুলিকে ঠিক গাছের মতন কোনো নির্দিষ্ট রূপ দেননি। গাছের পাতাগুলিকে ঠিক পাতার মতন করে তৈরী করেন নি। পাতার মধ্যে দিয়ে অস্পষ্ট আলো আর ঝিরঝিরে বাতাস ব'য়ে চলেছে এমন একটি ধারণা দর্শকের মনে সৃষ্টি করেছেন। গাছের ডালপালার নানান বিকৃত ভাব, মানুষের জীবন যেমন নানান খাদে বিকৃত। শত-শত মূর্তি। সবাই আবরণমুক্ত। নগ্নতাই এখানে যেন প্রকৃতির একমাত্র সহনীয় আবরণ। কেউ বৃদ্ধ, কেউ প্রৌঢ়, স্বাস্থ্যবান তরুণ নরনারী, আবার শিশুও। প্রতিটি মূর্তি দুপুরবেলার সূর্যালোকে একভাবে প্রতিফলিত হয়, পড়ন্ত রোদে অন্যভাবে ও সন্ধ্যায় অন্য আরো কিছুভাবে। আলো আর ছায়ার মাধ্যমে শিল্পী অনেক কিছু বলতে চেয়েছেন, সার্থকভাবে বলেছেনও। কেননা শিল্পের ধর্মই হলো শুদ্ধ চৈতন্যকে জাগানো, তাই আমার মতন অশিল্পী মনেও এদের আলোছায়া মূর্তিগুলির অন্তর্নিহিত সৌন্দর্যকে মূর্ত-করে তুলেছে। ভদ্রমহিলাকে বিনীতভাবে বললুম—ধন্যবাদ, আপনার সময় নষ্ট করলুম না তো?

চোখ তুলে তিনি সম্পূর্ণভাবে আমার মুখের দিকে তাকালেন। আমিও নিঃসঙ্কোচে তাঁকে নিরীক্ষণ করলুম। দীর্ঘাঙ্গী নর্ডিক যুবতী। চোখের মণি দুটি চকচকে নীল। মাথার চুল চেস্নাট ব্লন্ড। চকোলেট রঙের চেককাটা ওভারকোট। ফিগারটি চোখ মেলে দু-দণ্ড দেখবার মত। দস্তানায় ঢাকা হাতের আঙুল দেখবার উপায় ছিল না—আঙুলের সুতীক্ষ্ণ ডগা নাকি মানুষের শিল্পমনের পরিচায়ক।

হেসে তিনি সপ্রতিভভাবে বললেন, আপনি বোধ হয়

এশিয়ান? মনে হয় ইণ্ডিয়ান?

আমার নাগরিকতা স্বীকার করলুম। মধুর হেসে তিনি বললেন, চলুন, পার্কটা ঘুরি।

আমি বোধ হয় প্রয়োজনের অতিরিক্ত খুশী হয়েছিলুম, আর সেই আহ্লাদ হয়তো বোকার মতন প্রকাশ করে ফেলেছিলুম চোখেমুখে। ভদ্রমহিলা বললেন, শিল্প কিন্তু দল বেঁধে দেখার জিনিস নয়!

এত মূর্তি—মূর্তির মেলা। মূর্তিগুলি প্রচণ্ডভাবে আমাকে নাড়া দিচ্ছে। নগ্ন দুটি নারীমূর্তি মেঝের উপর কাঁধ ও মাথা রেখে সামনের দিকে সমকোণে পা দুটিকে পরস্পরের হাঁটুর সঙ্গে ঠেকিয়ে দিয়ে আবার সমকোণেই একই সঙ্গে উপরে তুলে ধরেছে।

মায়ের অন্তরঙ্গ হাত ধরে সন্তান চলেছে। সন্তানের সে কী বলিষ্ঠ ভঙ্গী! শিশুটির চোখ দুটিতে যেন বিশ্বের জিজ্ঞাসা।

সিঁড়ির একপাশে স্তূপীকৃত কান্তিময় কতকগুলি নরনারীর মূর্তি, কমনীয়তা ওদের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে—একজনের বুকে অন্য আর একজন, তারও উপরে আরো একজন, আবার একজন। সিঁড়ির ডান ধারেই প্রশান্তমূর্তি শ্মশ্রুমুখে দুজন বৃদ্ধ, হাঁটুতে হাত রেখে বসে চিন্তিত।

অদূরেই পুরুষের পিঠে হেলান দিয়ে একটি নারীমূর্তি মুখ ঢেকে বসে রয়েছে, পুরুষের চোখে দার্শনিকের দৃষ্টি। নিকটেই বলয়াকৃতি চক্রাকারে দুটি যুগল নরনারী আকাশে ঘূর্ণায়মান, ওদের চোখেমুখে পারলৌকিক এক আনন্দ।

একটি নারীমূর্তি ছুটে চলেছে অকস্মাৎ যেন নিয়তির ডাক শুনে। দূরের বৃদ্ধটি চোখ বুজে দু' হাতের তালুতে আঁজল ভরে জলপান করছে। ভাবখানা, অমৃতের কি শেষ আছে?

একটি বেদীর উপর বহু মূর্তির সমাগম। কেউ দাঁড়িয়ে; কেউ বসে; কেউ দূরের কাকে যেন উদ্‌গ্রীব হয়ে দেখছে; কেউ পাশের কারুকে সামলাচ্ছে; মা ক্রন্দনরত শিশুকে বুকে ধরে সান্ত্বনা দিচ্ছে; ছোট ভাই তারও দুটি অনুজকে দু' হাতে আগলে রয়েছে। সামনের নারীটি পুরুষটির গাল ধরে প্রশান্তমনে অধরে চুমু খাচ্ছে। পিছনের পুরুষটি আকাশের দিকে তাকিয়ে আগামী দিনকে যেন প্রার্থনা জানাচ্ছে—বুদ্ধি দাও, জ্ঞান দাও।

আমরা একটি সেতুর উপর দিয়ে এগিয়ে চললুম। সামনেই একটি পুরুষের প্রতিমূর্তি—তার সঙ্গিনীকে দু হাতে বুকে জড়িয়ে ধরে আদর করছে। সঙ্গিনীর দেহভঙ্গীটি এত সুন্দর, এত সুন্দর—সব মিলিয়ে এও যেন এক নতুন স্বর্গ।

অনেক সময়েই আমি এই রসাভিসারের মর্মগ্রহণ করতে পারি না। মূর্তিগুলিকে অবাক হয়ে দেখি, তবু মগজে ঠিকমতন এদের নীরব ভাষা পৌঁছয় না। আজ এরা আমার কাছে মূক, কিন্তু তিন হাজার বছর পরের মানুষ যখন মাটি খুঁড়ে এদের আবিষ্কার করবে তখন তারা কি ভাববে? আমরা মাত্র সাত শো আট শো বছর আগের কোনার্ক খাজুরাহো সম্বন্ধে আজ কি ভাবছি? আমাদের অনুসন্ধিৎসা আজও এত স্তিমিত কেন?

অন্য আর একটি আলিঙ্গনবদ্ধ নগ্ন যুগলমূর্তির সম্মুখে এসে সংযত কণ্ঠে কিন্তু উজ্জ্বল চোখে ভদ্রমহিলা বললেন, আমাকে সবাই জীন বলে ডাকেন—জীন জানসেন।

আমি আমার নাম বললুম।

যথামত দূরত্ব বজায় রেখে জীন জানসেন বললেন—দেখুন, ভাইগল্যাণ্ডের এই অপূর্ব পার্ক আজও আমাদের নিকট এক অপার বিস্ময়। জীবনের চল্লিশটি বছর কারো কাছ থেকে এক কপর্দক দক্ষিণা না নিয়েও তিনি মূর্তিগুলি সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু আজও আমরা সঠিক জানিনে, শিল্পী তাঁর শিল্পের মাধ্যমে কি বলতে চেয়েছেন। সত্যিই তো, শিল্পীর কাজ নয় তাঁর নিজ শিল্পের সত্যাসত্য নির্ণয় করা। সে তো ইতিহাস করবে। কিন্তু এও তো সুস্পষ্ট, উদার পৃথিবীর চারিধারের বিশৃঙ্খলা থেকে তিনি একটা প্যাটার্ণ খুঁজতে চেয়েছেন।

আমি অনুমান করি, ভাইগ্‌ল্যাণ্ড এমন একটি সমাজ কল্পনা করতে চেয়েছিলেন যেখানে মানুষ বিপর্যস্ত ও শৃঙ্খলাহীন পৃথিবীতে বসবাস করেও জীবনের সুর খুঁজে নেবে, সে সুরে রাজনীতির দুর্গন্ধ থাকবে না—ধনীর অহমিকা, দারিদ্রের দীনতা, আর মধ্যবিত্তের সংস্কারান্ধতার মূঢ়তা এ-সবও থাকবে না।

আমরা এগিয়ে চললুম। আমাদের দু-ধারে নানান প্রতিকৃতি। প্রত্যেকটিই শিল্পীর কালাতীত দৃষ্টিভঙ্গীতে দীপ্ত। একটিও প্রচলিত রীতির অন্ধ অনুকরণে রচিত নয়। সজীব, বড্ড বেশী সজীব।

কোথাও ক্রীড়ারত শিশুরা নেকড়ে বাঘের মুখগহ্বরে সহাস্যে হাত পুরে দিচ্ছে, কোথাও নারী ও পুরুষ বিনা উচ্ছ্বাসে পরস্পরকে ভালোবাসছে, কোথাও বা অলীক একটি স্বপ্নকে শিল্পী এমন অপূর্ব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন যে, অনেকক্ষণ ধরে রহস্যময় মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে থাকলে জীবনে কেমন একটা বিস্বাদের সৃষ্টি হয়, আবার একটা অদম্য জীবনপিপাসাও জাগে।

জীন আমার আস্তিনে হাত রাখলেন। সুন্দর ঝকঝকে দাঁতে ভোরের আলোর মত হেসে বললেন, এবার কিন্তু আমরা ভাইগল্যাণ্ডের সবচেয়ে অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য আর সেরা শিল্পনিদর্শনের কাছে এসে পড়েছি। দেখছেন তো ঐ গগনচুম্বী বিশাল স্তম্ভটি।

(দুই)

অনাবৃত অভিমানকুণ্ঠিতা একটি নারীমূর্তির পাশ দিয়ে আমরা পার্কের কেন্দ্রস্থলে স্তম্ভটির নিচে এসে দাঁড়ালুম।

আমি জানতুম, এই স্তম্ভটি ভাইগল্যাণ্ডের সর্বোত্তম ও মহত্তম সৃষ্টি, যেটিকে অনেকেই তাঁর 'জীবন-দর্শন'-ও বলে থাকেন। সতের মিটার লম্বা এই প্রস্তর-খণ্ডে উৎকীর্ণ একশত একুশটি পূর্ণাবয়ব নরনারীর নগ্নমূর্তি। গোলাকৃতি প্রশস্ত একটি চত্তরের পরিধিতে প্রকৃতির আবরণে স্বপ্নায়িত কামনার নানান প্রতিকৃতি। চারিধারের সিঁড়িতেও মূর্তির সারি। একদা আর্যভূমি সুইডেন-সীমান্ত থেকে সংগৃহীত স্তম্ভটি অখণ্ড একটি নিরেট গ্র্যানাইট পাথর। ওজনে প্রায় দুশো সত্তর টন। মিশরের প্রাচীন অবিলিস্‌ক ব্যতীত এত বড় পাথরে তৈরী ভাস্কর্যের নমুনা কোনো দেশে কখনো আমি দেখিনি। শুনেছি, এমনটি আর কোথাও নেই।

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সমুদ্রপথে

পাথরটিকে অসলো-পোতাশ্রয়ে আনা হয়। তারপর উনিশশত তেতাল্লিশের মার্চ মাসে স্তম্ভটির গায়ে শিল্পী তাঁর শেষ মূর্তিটি উৎকীর্ণ করার পর, শোনা যায় ভাইগল্যান্ডের জীবন-দর্শনের প্রতিবিম্ব মূর্ত হওয়ায় যখন মহত্তর কিছুই আর করণীয় রইল না, তাঁর শিল্পমন অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। যুদ্ধের হিড়িকে বিশ্বের কোথাও সাড়া পড়লো না একজন মহৎ শিল্পীর তিরোধানে, কিন্তু সেদিন নরওয়েতে এমন মানুষ বড় বেশী ছিলেন না যিনি গুস্তাভ্ ভাইগল্যান্ডের মৃত্যুতে অভিভূত হননি, এমনকি একদা-নিন্দুকরাও শ্রদ্ধায় মাথা নত করলেন।

শিলাস্তম্ভটির প্রত্যেকটি আলেখ্য সরীসৃপের মতন পিছনে গলিয়ে যেতে চাইছে তলা থেকে উপরে। তলার মূর্তিগুলি ভিড়ের চাপে অস্থির। ক্রমশ যত উঁচুতে মূর্তিগুলি উঠছে ভিড় ততই কমে আসছে। সবার উপরের মানুষগুলি মুক্ত, যেন আকাশের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে।

তলার মূর্তিগুলি একে অন্যকে পিষে, দলে থেঁতলে, উপরে উঠবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। উঠতে পারছে না। আবার কেউ কেউ পারছেও। উপরের প্রবল চাপে অনেকেই মারা গেছে। স্তম্ভের মাঝখানের মূর্তিগুলিকে ঠিকমতন উঠবার ভঙ্গীতে দেখা যাচ্ছে। প্রথমে অনেকেই যেন বুঝতে পারছে না যে ওরা উপরে উঠছে। ওদের চোখ বোজা। দেহ আপন গতিতে চলেছে প্রবাহ-পথে। শিলাখণ্ডের বাঁ ধার দিয়ে গলিয়ে এ ওর মুখে পেটে কোমরে মাথায় পা রেখে ঠেলে-ঠুলে ক্রমশ সঙ্গীতের তরঙ্গের মত উপরে উঠছে।

'জীবন-দর্শনে'র মাঝপথে দেখা যাচ্ছে মূর্তিগুলি এবার যেন অনেকটা সজ্ঞানে উপরে উঠতে চাইছে। তবু কোনো কোনো মূর্তি নিচের দিকে আবার পিছলে যাচ্ছে, যেন সঙ্গীতের একটা কোমল সুর উপর থেকে নিচে নেমে গেল। কিন্তু তলারও একটা প্রচণ্ড বিকর্ষণ আছে, সেই বিকর্ষণে একেবারে তলায় কোনো মূর্তিই গড়িয়ে পড়তে পারছে না। কয়েকটি শিশুও খাবি খাচ্ছে এই ভিড়ের মধ্যে। কোনো মূর্তিকেই শিল্পী এমনভাবে সৃষ্টি করেন নি যেটিকে দেখে দর্শকের এমন মনে হতে পারে মূর্তিটি 'জীবন-দর্শনে'র বাইরে ছিটকে পড়ছে। ছন্দ ও সুরের এমন সমন্বয়, আকর্ষণ ও বিকর্ষণের এমন আবেদন মনে হয় বিচিত্র এক যাদু।

জীনও নিঃশব্দে আমার পাশে দাঁড়িয়ে। আমার সঙ্গে এমন একটি বিদুষী ও সত্যিই সুন্দরী তরুণী রয়েছেন এও আমি ভুলে গিয়েছিলাম।

জীন হঠাৎ ঘুমভাঙ্গা স্বরে বললেন,—শিলাস্তম্ভটি এবং পার্কের সব মূর্তিগুলোতেই আপনাদের কোনার্ক ও খাজুরাহোর কিছুটা মিল হয়তো দেখতে পাবেন।

আমার মনেও এমনই একটি প্রশ্ন নিমেষের জন্য ঝিলিক দিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্নটির রূপ ঠিকমতন দিতে পারছিলুম না। অবান্তর, তবু বিস্ময়বিমুগ্ধ হয়ে বললুম—আপনি বুঝি ভারতবর্ষে গেছেন?

নীল চোখ দুটি আমার দিকে তুলে ধরে লীলাপূর্ণ ভঙ্গীতে তিনি বললেন, না-তো নরওয়ে ছেড়ে কোথাও আমি যাইনি।

একটু পরেই উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি বললেন, আপনাদের দেশ সম্বন্ধে, বিশেষ করে দর্শন ও শিল্প সম্বন্ধে খানকতক বই পড়েছি।

যে প্রশ্নটি ভারতীয় কোনো বিদুষীকেও করতে আমার সাহসে কুলোতো না সুযোগ পেয়েও সেই প্রশ্নটি অনুচ্চারিত রেখে গলাটা পরিষ্কার করে বললাম, কোনার্ক আর খাজুরাহোর সঙ্গে ভাইগল্যান্ডের শিল্পের কী মিল দেখলেন?

দূরত্ব আগের মতনই বজায় রেখে একটু ভেবে নিয়ে জীন বললেন—আপনি যাকে 'মিল' বলছেন ঠিক তা বোধহয় নেই তবু মনে হয়, যেন কোথাও অনেকখানি সাদৃশ্য আছে। সুর এক কিন্তু স্বর আলাদা। মহৎ শিল্পমাত্রেই সঙ্গতি থাকতে যে হবেই। যতটুকু আমি বুঝি, আপনাদের প্রাচীন শিল্পীরা ভাইগল্যান্ড অপেক্ষাও শতগুণ মুক্ত ছিলেন, তাই জীবনকে অত গভীরভাবে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারতেন। জীবনকে উপলব্ধি না করলে শিল্পের মাধ্যমে জীবনের প্রতিফলন করা অসম্ভব। জীবনকে যদি বিচার না করেই আমরা গ্রহণ করি তাহলে সে জীবনই যে মানুষের বিড়ম্বনা; এই বিড়ম্বনা থেকে যত দ্বন্দ্বের সূত্রপাত।

আমি চমৎকৃত হয়ে বক্তার মুখের দিকে চোখ মেলে তাকাতেই সংকুচিত হয়ে তিনি একটু হেসে বললেন—আপনাদের প্রাচীন দর্শনে বলে, নিজেকে চেন।

যেন অনেকখানি বক্তৃতা দিয়ে ফেলেছেন এমনি একটি ব্রীড়ানত লজ্জায় আরক্তিম বদনে আবার বললেন, কিছু মনে করবেন না; এসব কথাতো আপনারা জানেনই।

সাগ্রহে বলতে চাইলুম, না-না, আমি কিছুই জানিনে, আপনি বলুন, শুনতে ভালো লাগছে।

দর্শনের আলোচনার শেষ নেই। দর্শনের আলোচনা ছেড়ে আমরা জীবনের প্রতিচ্ছায়ারূপী গোলকধাঁধার চারিদিকে বেড়াতে লাগলুম।

দর্শকের ভিড় ক্রমশ তরল হয়ে এলো। উত্তর-পূর্ব কোণ থেকে আবার 'জীবন-দর্শনে'টিকে নিরীক্ষণ করতে লাগলুম। শিলাস্তম্ভটি যতই দেখি আর যতবারই দেখি না কেন অপার বিস্ময়ে স্তম্ভিত না হয়ে পারিনে। ক্লান্ত মনুষ্যমূর্তিটি স্তম্ভের উপরে আকাশে উঠে আরো ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আট-দশটি শিশু। ওদের মুখে ক্লান্তির চিহ্ন নেই। ছেড়ে-আসা পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ের চোখে ওরা কি ভাবছে?

বয়স্কদের মধ্যে শেষ পর্যন্ত মাত্র দুজনই স্থলন ও পতনের ঊর্ধ্বে যেতে সমর্থ হয়েছে। একজন পুরুষ; অন্যটি নারী। নারীর ভঙ্গিমাটি প্রার্থনারত। পুরুষ চিন্তান্বিত, পদস্খলন থেকে কোনো রকমে নিজেকে বাঁচানোর ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে। মনে হয়, নীচের বয়স্করা স্তম্ভের উপরিভাগে পৌঁছুতে পৌঁছুতে ক্রমশ শৈশবে ফিরে গেছে, সংখ্যায় অত তো শিশু তলার দিকে ছিল না।

আমার কোটের আস্তিনে হাত রেখে জীন অত্যন্ত আস্তে আস্তে বললেন—মানুষ সম্বন্ধে এমনই একটি অপ্রত্যাশিত ব্যাখ্যা শুনেছি, আপনাদের দর্শনে সম্ভবত ছিল। সংস্কারমুক্ত মানুষ শিশুতে পরিণত হয়। ভাইগল্যান্ডও হয়তো তাঁর 'জীবন-দর্শনে' শেষ পর্যন্ত সেই ধ্রুব-ই উপলব্ধি করেছিলেন, এইখানেই সহসা তাঁর মৃত্যু হলো।

স্পষ্টতই মুক্ত জীবনসৈনিক তাঁর শৈশবে ফিরে গেলেন। ভাইগল্যান্ড 'জীবন-দর্শনে' হয়তো দেখিয়েছেন

—শিশুই একমাত্র মুক্তপ্রাণী। শিশুই ভাস্বর। সংস্কার-মুক্ত নির্গ্রন্থ মানুষই অনাসক্ত, তাই ভগবান।

আমরা স্তম্ভটির তলায় মেঝেতে বসলুম। তুষারপাতে দৃষ্টিশক্তি কমে আসছে। চোখের চশমার উপর টুপির কিনারা নামিয়ে দিয়ে জীন বললেন—শিশুই যে একমাত্র মুক্তপ্রাণী শিল্পী আরো স্পষ্ট করে তা দেখাতে চেয়েছেন স্তম্ভশিখরের তিনটি শিশুর মাধ্যমে; ওরা তিনজনেই স্বর্গের দিকে তাকিয়ে।

স্তম্ভ থেকে খানিকটা দূরে সরে দাঁড়িয়ে দেখলুম, সত্যিই তো! মনে হলো, উপরের শিশুগুলি আর তো পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে নেই! ওরা যে সত্যিই স্বর্গের পানে তাকিয়ে রয়েছে!

স্তম্ভের গহন অতলের রুদ্ধ মানুষটি মৃত অথবা জ্ঞান হারিয়েছে। বৃদ্ধের মাথাটি নীচে, কাঁধের উপরে, বেঁকে-চুরে একটি তরুণী। ওদের দিকে পিছন ফিরে সর্পিল-ভঙ্গীতে অন্য আর একটি যুবতী দেহ এলিয়ে রয়েছে, যেন পাড়ে আছড়ে-পড়া সমুদ্রের ফেনিল একটি নিঃসঙ্গ ঢেউ। উপরে উঠবার ক্ষমতা নেই।

এদেরও উপরে আরো নরনারী। মাঝপথে একটি মেয়ে চিড়েচ্যাপটা হয়ে মুখ-কান শক্ত করে চেপে ধরে রয়েছে। এমন হতাশা, এমন লজ্জাকরুণ ভঙ্গিমা।

পার্কের গেট বন্ধ হওয়ার সময় এখনো হয়নি। তবু আমরা পার্কের বাইরে এলুম। চৌরাস্তার কাফেতে ঢুকলুম। জীন টুপি খুলে হাঁপছাড়ার মতো বললেন—এবার আমি আমার আমাতে ফিরে এলুম।

দুমগ বিয়ার আর হামবুর্গার আনিয়ে এতক্ষণে সম্মোহিতভাব থেকে মুক্ত হয়ে হেসে বললুম, সে কেমন?

হাসি চেপে জীন দুষ্টুমির চোখে বললেন, দর্শনের মধ্যে থাকলে দম বন্ধ হয়ে আসে। দর্শন থেকে একটু দূরে বসে বিয়ার হাতে নিয়ে সাদা চোখে জীবনকে দেখতে আরো ভালো লাগে।

ওঁর চোখে দুষ্টুমির মধ্যেও বুদ্ধির স্বচ্ছ আলো।

জীন বললেন, আপনাদের দেশে কোনার্ক ও খাজুরাহোকেও নাকি কেউ কেউ 'নোংরা শিল্প' বলেন। জীবন নোংরা? শিল্প আবার কখনো 'নোংরা হয় নাকি?

যদি বলি, 'কেউ কেউ ভাবে, সবাই নয়' তা হলেও ভুল বলা হবে, কেননা মুখে যারা 'নোংরা' নাও বলেন, শুচি-গ্রস্ত সঙ্কীর্ণতার বাইরে এই শিল্পকে মেনে নিলেও তাদের মধ্যে ক'জনের সাহস বা সামর্থ্য আছে জীবনকে স্বীকার করে নেওয়ার? নৈতিক মূল্য বিচার আমরা ক'জন করি? আবেগের প্রাবল্যে অস্বস্তিকর জীবনের প্রতিফলন শিল্পে স্বীকার করে নিলেও সে আবেগও মাত্র শিথিল উৎসাহ; এই নিরর্থক উৎসাহকে নিরাপদ-ভাবে দূরে রাখাই তো সামাজিক মানুষের তথাকথিত বিধিদত্ত কর্তব্য!

জীন আমার গ্লাসে সহসা সশব্দে নিজের গ্লাস ঠুকে কপট গাম্ভীর্যে বললেন—Let us toast to the Devil in the artist for the Devil is the God Himself!

(তিন)

সূর্য এখনো অস্ত যায়নি। যাবো-যাবো করতেও একটু দেরি আছে। মেরুপ্রান্তকে সূর্যও যে ভালবাসেন! যাবো বললেই তো হুট করে এখান থেকে যাওয়া যায় না।

সমুদ্রের গর্জনের সঙ্গে হয়তো নাবিকের গিটারের বিষণ্ণ শব্দ ভেসে আসছে। কাফে থেকে বেরিয়ে আবার আমরা পার্কের সিঁড়ির ধারে এলুম যেখানটায় সামনের দিকে ডান পা একটু এগিয়ে দিয়ে আনন্দদীপ্ত মুখ তুলে নারীর একটি মর্মরমূর্তি বসে। দণ্ডায়মান একটি পুরুষমূর্তি নিচু হয়ে নারীমূর্তিটির মুখখানি দু হাতে ধরে তাকে আদর করছে।

মূর্তিটির সামনে মুহূর্তের জন্য থমকে দাঁড়িয়ে জীন সিঁড়ি বেয়ে তুষারের মধ্য দিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন; আমিও। একটু উপরেই অন্য আর একটি পুরুষের প্রতিমূর্তি। প্রতিমূর্তিটির পিঠে পিঠ দিয়ে বসে রয়েছে নারীর একটি মূর্তি। ডান ধারে, নিচে দুজন কিশোর বালক বলিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গীতে আকাশের দিকে তাকিয়ে। উপরেই ডান ধারে সিঁড়ির পাশে অন্য আর একটি নরনারীর যুগলমূর্তি। ওদের পিছন থেকে রক্ত-মাংসের একটি যুগলমূর্তি নিবিড় বন্ধনে নিচে নেমে গেল নিঃশব্দে।

আমি জীনের পাশেই ছিলুম। মুখ তুলে তিনি হেসে বললেন—দেখুন তো এ কেমন নিয়ম, নীতির কাছে প্রাণের পরাজয়, সংস্কারের কাছে জীবনের?

মৌন আমাকে থাকতেই হলো, কেননা জীবনকে যে আজ নীতির চক্রে পিষে ফেলেছি! তার ব্যাখ্যার কি বা আছে প্রয়োজন!

আর একটি যুগল প্রতিকৃতির সামনে এলুম। দুজনের কোলে একটি শিশু। আরো একটু পরে অনেকগুলি মূর্তি পেরিয়ে প্রাণবন্ত একটি প্রণয়াকাঙ্ক্ষিনীর সামনে এলুম। চোখ তুলেই দেখি সামনেই আবার 'জীবনের দর্শন', যার অপরিহার্য উপাদানই হলো পার্কের অন্যান্য সব কটি প্রতিমূর্তি। নিশ্বাসহীন নিস্তব্ধতায় একটা স্বপ্ন যেন জমে পাথর হয়ে গেছে। আবার আমার কানে অপূর্ব একটা সঙ্গীতের ঝঙ্কার ভেসে গেল, যেন অকস্মাৎ চমকিত বিদ্যুল্লেখা।

কার রচিত সঙ্গীত জানি না। জানবার প্রয়োজনও নেই। কিসের সঙ্গীত জানতে চাইনে। যতদূর দৃষ্টি যায় আমার চারিপাশে মধ্যরাত্রের এই সূর্যাস্তের সময় নীহারিকার স্রোতের মতন শুধু অপরূপ শত-সহস্র মূর্তি দেখতে পাচ্ছি।

কে যেন বিস্মৃতির পাতাল থেকে আমার স্বপ্নের মধ্যে জীনের কোমল কণ্ঠে বলছে—Don't stop. Please, say it from that height, is the sundown so beautiful?

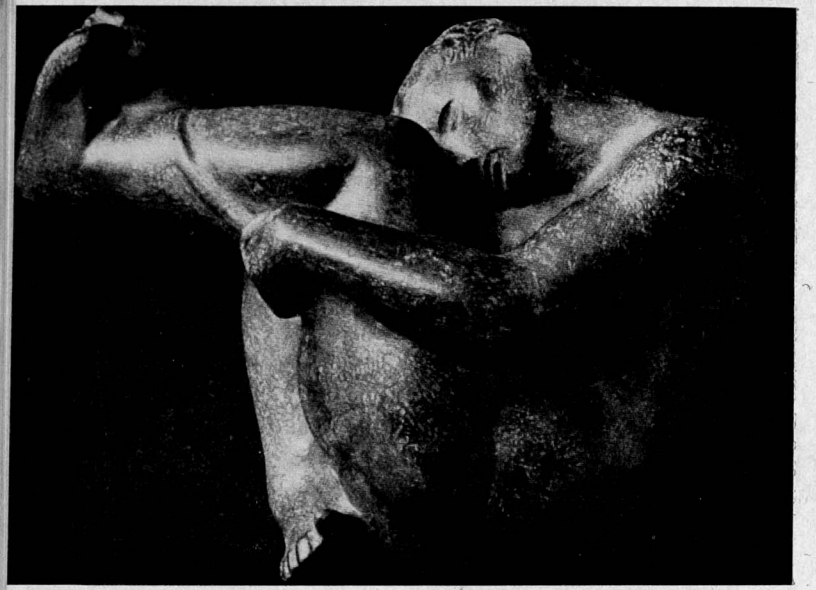

ডাচ ভাস্কর ফ্রেড ক্যারাসো-কৃত : জনৈক শ্রমিক।

আধুনিক ডাচ ভাস্কর্য

অহিভূষণ দাশগুপ্ত

দক্ষিণ কোলকাতার একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শিল্প সম্পর্কে প্রাঞ্জল ও তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধাদির রচনাকার। সুপরিণত চিন্তার অধিকারী।

রেমব্রান্ট্, ভ্যান গগ্ প্রভৃতি ডাচ শিল্পীদের নাম শোনেনি এমন কেউ নেই। এই সমস্ত নামকরা চিত্রশিল্পীদের খ্যাতি-প্রতিপত্তির মাঝে চাপা পড়ে গেছে নেদারল্যাণ্ডের ভাস্করদের খ্যাতি। হয়তো বা অনেকের ধারণাই এই যে ওদেশের চরিত্রে ভাস্কর্যের প্রতি কোনোও প্রবণতা নেই। অথচ চতুর্দশ শতকের খ্যাতিমান ভাস্কর ক্লস স্লাটার ডাচ দেশেরই। বারগ্যাণ্ডি তাঁর কাজের জায়গা। আর সকলেই জানে তিনি ফরাসী দেশীয়।

ডাচ দেশের শিল্পকলার ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করা যায় তাহলে বেশ ভালো করেই দেখা যাবে যে, যে-সব চিত্রশিল্পীরা যে-সব গুণের জন্যে জগদ্বিখ্যাত তাঁদের সব কিছু গুণই আছে ডাচ ভাস্করদের মধ্যেও। সব-সেরা গুণ 'বাস্তবতা'। ডাচ ভাস্কর্যের কৃতিত্ব এই 'বাস্তবতা'র মধ্যেই।

অথচ এটা বোধ হয় বিস্ময়ের যে, সংস্কার আন্দোলনের পরে সমগ্র ইউরোপে, বিশেষ ভাবে ফরাসী দেশে ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের যে পরিণয় সাধিত হোয়েছিল, তার দ্বারা ডাচ শিল্পীরা বিন্দুমাত্র অনুপ্রাণিত হবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হোয়েছিল। ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের যে অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছিল, তার উদাহরণ মিলবে ফরাসী দেশের গির্জাগুলোতে। নেদারল্যাণ্ডে এই সমন্বয় সাধিত না হওয়ার কারণ সে-দেশের 'স্পিরিচুয়াল ও মেটিরিয়াল আইকোনোক্লাস্‌ম্'। হল্যাণ্ডের বিখ্যাত স্থপতি বের্‌লাগে বিংশশতকের প্রথম দিকে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের মধ্যে একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। দুটোর মধ্যে যে 'গ্যাপ' তা পূরণ করার চেষ্টা করেন। এই কারণে তাঁকে নতুন ধারার পথ-প্রদর্শক বললে অত্যুক্তি হয় না। লাম্‌বের্‌টাস জিল (১৮৬৬-১৯৪৭) এবং মেন্‌ডেস্ দা কস্‌টা (১৮৬৩-১৯৩৯) প্রথম চেষ্টা করেন প্ল্যাস্টিক আর্ট নিয়ে কিছু করার। লোকের মনে যে বদ্ধ ধারণা ছিল অর্থাৎ প্ল্যাস্টিক আর্টের ক্ষেত্রে নেদারল্যাণ্ডের কোনও অবদান থাকতে পারে না—এই ধারণা এঁরা দূরীভূত করেন। তাঁদের কাজ যে খুব কঠিন ছিল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রথমতঃ এ সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে কোনও উৎসাহ ছিল না, আর দ্বিতীয়তঃ নতুন ক'রে লোকের কাছে এর পরিচিতি তুলে ধরতে হবে। ভাস্কর্য সম্পর্কে জনসাধারণের ঔৎসুক্য বা উৎসাহ যে কত কম তা নেদারল্যাণ্ডের শহরগুলোতে পাবলিক মনুমেণ্টের অভাবেই বোঝা যায়। এ ছাড়া, প্রকাশ্যে যে সব মনুমেণ্ট আছেও ছেলেরা তার যথেষ্ট ক্ষতি-সাধন করে থাকে এবং সে দেশে এটা একটা বড়ো সমস্যার মতো।

যুদ্ধোত্তর ডাচ ভাস্কর্যের আলোচনা করার আগে তিনজন শিল্পীর নাম করতে হয়। এঁরা ল্যাম্‌বের্‌টাস জিল ও মেন্‌ডেস দা কস্‌টার সংগে আধুনিক ভাস্করদের একটা যোগসাধন করার চেষ্টা করেছেন। তিনজনের একজন হোলেন জন রেদেকার (১৮৮৫-১৯৫৬)। অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী, নির্ভীক ও আপোষ-হীন সংগ্রামী ছিলেন এই শিল্পী। কারিগরী বিদ্যাতেও ইনি পারদর্শী ছিলেন। ডাচ ভাস্কর্যে একটি নতুন ধারার প্রবর্তক ইনি। 'পারসোনাল পোইণ্ট্'র স্পর্শ তাঁরই শিল্পকর্মে প্রথম দেখা গেল।

তিনজনের দ্বিতীয় জন হোলেন হিলডো ক্রুপ। এঁর জন্ম ১৮৮৪। বহুমুখী প্রতিভা এঁর। ডাচ জনসাধারণকে ভাস্কর্য-উৎসুক করে তোলেন ইনি। দেশের

আধুনিক ডাচ ভাস্কর মারি আঁদ্রিয়েসেন নির্মিত ভাস্কর্যের নিদর্শনটির নাম : যুদ্ধের বোমায় আহত।

নানা জায়গায় নানা কাজ তিনি করেন। মূর্তি গড়া এবং ব্রিজ বা স্কুল ডেকরেশনের ব্যাপারে ইনি জনসাধারণের খুব ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

তৃতীয় জনের নাম হোল জ্যান ব্রনার। জন্ম : আঠারশো একাশি। ডাচ দেশের বিখ্যাত লেখক হিলডেব্রান্ড্-এর স্মৃতিস্তম্ভ হিসেবে তাঁর উপন্যাস 'ক্যামেরা অব্স্-কিউরা' থেকে ন'টি মূর্তির একটি গ্রুপ ব্রনারের বিখ্যাত শিল্পকৃতি। ব্রনার অবশ্য শিক্ষক হিসেবেই অধিক খ্যাত। আম্স্টার্ডাম-এর য়্যাকাডেমি অফ্ ফাইন আর্ট্স্-এ ইনি ছিলেন উনিশশো চোদ্দ থেকে উনিশশো সাতচল্লিশ। ডাচ ভাস্করদের মধ্যে বোধ হয় এমন কেউ নেই, যিনি তাঁর ছাত্র নন। ডাচ ভাস্কর্যের যা গৌরব তার অনেকখানি ব্রনারের প্রাপ্য।

রেদেকার, ব্রনার এবং রুপ—এঁরা এমনই ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন যে তৎকালীন ইউরোপের অন্যান্য দেশের ভাস্কর্য সম্বন্ধে তাঁদের কৌতূহল ও আগ্রহ থাকলেও কখনো নিজেরা অন্যের ভাবধারায় আচ্ছন্ন হননি। আপন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার মত শক্তি তাঁদের ছিল। এই কারণে অনেকে ডাচ ভাস্কর্যকে প্রাদেশিক সীমার মধ্যে সংকীর্ণ বলে থাকেন। কিন্তু ডাচ শিল্পীরা এর ফলে (অন্যের প্রভাবে প্রভাবিত না হওয়ার) অকারণ নকলনবিশি অথবা উচ্ছৃঙ্খল পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মোহ-

ঘোড়ার মূর্তি। নির্মাতা ডাচ ভাস্কর ভেসেল কাউসিন।

গ্রস্ত হ'য়ে সময়ের অপব্যয় করেননি—এ কথা সকলেই মানেন। এইভাবে একটা সুস্থ এবং স্বাধীন-সুন্দর পরিবেশ গড়ে ওঠায় অনাগত শিল্পীরা পেলো 'নিজত্বের' আস্বাদন। ডাচ শিল্পের স্বকীয়ত্ব প্রস্ফুট হোল, কারণ এর ভিত ছিল স্পিরিচুয়াল ট্র্যাডিশানের গ্র্যানিট স্তরে। সুদৃঢ় ভিতের ওপর সুসমঞ্জস শিল্পের জন্ম হলো।

যুদ্ধবিগ্রহ, প্রতিরোধ-আন্দোলন, পরাধীনতার বিক্ষোভ সব কিছুর মধ্যেই ডাচ শিল্পীরা জাতীয় চেতনাকে রূপ দেবার চেষ্টা করলেন শিল্পের মাধ্যমে। ভবিষ্যত বংশধরদের জন্যে দেশের ইতিহাসকে এঁরা লিখে গেছেন মূর্তি আর মনুমেণ্টের আখরে।

প্রতিকূল পরিবেশ সত্ত্বেও হল্যাণ্ডের ভাস্কররা অবিরত সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছেন। সময় সময় ব্যর্থতা বরণ করতে হোয়েছে। যদিও বিশেষ সংস্থা প্রতিষ্ঠা ক'রে চেষ্টা হোয়েছে শিল্পীদের যথাযথ পথের নির্দেশ দিতে। জন রেডেকারের নাম করা যায়। আম্স্টার্ডাম-এর পার্কে তাঁর বিখ্যাত মনুমেণ্ট 'ড্যাম' শত গুণ-বিশিষ্ট হোলেও অসার্থক। একমাত্র কারণ, ভাস্কর্য এবং স্থাপত্যের মধ্যে তখনও সমন্বয় সাধিত হয়নি।

একজন শিল্পীর নাম করা যেতে পারে, যিনি সমগ্র জাতির মানসকে বিধৃত করলেন ভাস্কর্যের মাধ্যমে—যথাযথ রূপায়িত করলেন জাতীয় আবেগ ও অনুভূতি। এঁর নাম মারি আঁদ্রিয়েসেন। জন্ম : আঠারশো সাতানব্বই। যুদ্ধের বহু স্মৃতিস্তম্ভ তৈরী করলেন। অত্যাচারিত যুদ্ধবন্দী, বোমার আঘাতে আহত ও নিহত শান্তিপ্রিয় নর-নারী, যুদ্ধবিরোধী এবং স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমিক সংগ্রামী মানুষের বহু মূর্তি তিনি গড়লেন। 'গুলির সম্মুখে মানুষ', এবং 'মাও বোমায় নিহত শিশু'—তাঁর অনবদ্য সৃষ্টির অন্যতম। এঁর সবচেয়ে বিখ্যাত কীর্তি 'ডকার'। জার্মান অধিকৃত হল্যাণ্ডে ডাচ শ্রমিকেরা তাদের ইহুদী প্রতি-

বেশীদের প্রতি জার্মানদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিল। 'ডাকার' সেই প্রতিবাদের স্মৃতি। জাতির মর্মবেদনা এবং তার আশা-আকাংখাকে মারি আঁদ্রিয়েসেন যে রূপ দিয়েছেন এবং তার ফলে তিনি যে-ভাবে সকলের হৃদয় জয় করেছেন তা অভূতপূর্ব।

যুদ্ধের স্মৃতিকে উজ্জ্বল করে রেখেছেন আরও একজন ভাস্কর। তাঁর নাম উইম রেআ:স্। জন্ম : উনিশশো দশ। জন্মস্থান : আর্ন্‌হেম। শিক্ষা : লণ্ডন ও প্যারিস। প্রকাশভঙ্গির দিক দিয়ে ডাচ ভাস্কর্যে এঁর অবদান অভিনব। উনিশশো ছেচল্লিশ সালে জাইপেরস্লুইস অঞ্চলে একটি মনুমেণ্ট তৈরী করেন। এটা প্রতিরোধ আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। ডাচ ভাস্কর্যকে তিনি গতানুগতিকতার হাত থেকে মুক্তি দিয়েছেন। যুদ্ধোত্তর ডাচ ভাস্কর্যের অগ্রগতি এবং জনপ্রিয়তার মূলে বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত প্রদর্শনীগুলির দান অনেকখানি। আর্নহেম শহরের সন্‌স্‌বীক পার্কে তিন বৎসর অন্তর একটি আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রদর্শনীর শিল্পদ্রব্যগুলির মধ্যে ডাচ শিল্পীদের শিল্পকর্মের নমুনা খুব কমই থাকে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন শিল্পীদের শিল্পকৃতি ডাচ শিল্পীদের যে উৎসাহ, শক্তি এবং প্রেরণা দেয় সেইটেই প্রদর্শনীর বড়ো লাভ। এই প্রদর্শনী ছাড়াও মাঝে মাঝে ডাচ ভাস্করদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন হয়। ডাচ ভাস্করদের একটি সংঘও গড়ে উঠেছে। নগর-পরিষদের সহযোগিতায় মাঝে মাঝে মুক্তাঙ্গন প্রদর্শনীও হ'য়ে থাকে। এই সকল প্রদর্শনীর অন্যতম উদ্দেশ্য নতুন শিল্পীকে আবিষ্কার করা।

যুদ্ধের পরে দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার ফলে ভাবনা হয়েছিল যে ডাচ ভাস্কর্যের ক্রমোন্নতির পথ বুঝি রুদ্ধ হোল।

যতই ভয়ের কারণ থাক যুদ্ধোত্তর যুগে ভাস্কর্যের উন্নতিই পরিলক্ষিত হোল। রটারডামের বয়মান্‌স্ মিউজিয়মে যে প্রদর্শনী হোল তাতে নতুনত্বের আস্বাদন পাওয়া গেল। দেখা গেল যারা বয়োজ্যেষ্ঠ তাদের পূর্ণতা এসেছে আর নতুনেরা পেয়েছে একটা নির্দিষ্ট, সুপরিকল্পিত পথের সন্ধান। পায়ের নীচের মাটি তাদের শক্ত হোল, দাঁড়াবার উপযুক্ত হোল। এর জন্যে ব্রনার এবং তাঁর উত্তরাধিকারী এসারের কৃতিত্ব অনেকখানি। তরুণ শিল্পীদের স্বাধীন চিন্তা করার শিক্ষা এঁরা দিয়েছেন। শিষ্যেরা গুরুর অনুকরণ করেনি। আধুনিক ডাচ ভাস্কর্যের সব চেয়ে বড়ো কথা হোল মানুষ ও তার পরিবেশ। মানুষের সুখ-দুঃখ, ভাবভাবনা, তার হাসিকান্না দরদ দিয়ে, সরস করে শিল্পীরা তাঁদের মূর্তি ও মনুমেণ্টের মাধ্যমে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন।

বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে শ্রেণীকরণ করলে কয়েকজনের নাম করা যেতে পারে। বয়েসের দিক দিয়ে বিচার করলে আঁদ্রিয়েসেনের পর ফ্রেড ক্যারাসোর নাম করা যেতে

হল্যাণ্ডের অগ্রগণ্য ভাস্কর
কোরেমান রূপায়িত
মাতা ও পুত্রের মূর্তি।

পারে। জাতিতে ইনি ইতালীয়। যা কিছু কাজকর্ম সবই তিনি আম্‌স্‌টারডামে বসেই করেছেন। ইতালীয় ভাস্কর্যের গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারাটিকে বহন করে এনেছিলেন হল্যাণ্ডে। এঁর শিল্পকৃতি ব্যক্তিত্ব-উজ্জ্বল এবং শক্তিময়। হল্যাণ্ডে তাঁর বহু গুণমুগ্ধ বন্ধু থাকলেও ইনি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেন নি।

এর পর হিউবার্ট ভ্যান লিথ। উনিশশো আট সালে জন্ম। স্বয়ং-শিক্ষার্থী। ছোট ছোট কাজে এঁর অসাধারণ দক্ষতা।

বার্‌টাস সন্‌ডার। জন্ম উনিশশো চার। প্রতিকৃতি-বিশারদ। কোনোও রকম আধুনিকতার ধার ধারেন না। চিরাচরিত প্রথায় সুন্দর সুন্দর মূর্তি গড়েছেন ইনি।

চারলোট্‌ ভ্যান প্যালান্‌ড্‌। জন্ম : আঠারশো আটানব্বই। মহিলা ভাস্করদের অন্যতমা। এঁর শিল্পকৃতির ছন্দোময়তা লক্ষণীয়।

ফ্রি হাইল : এঁর গড়া 'মা ও সন্তান' মূর্তিগুলি বিখ্যাত তাদের কমনীয়তার জন্যে। ইনি বিখ্যাত ভাস্কর।

এল. পি. জি ব্রাণ্ট্‌ : বিখ্যাত শিল্পসমালোচক এবং অন্যতম ভাস্কর। এঁর কাজের মধ্যে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের ছাপ সুস্পষ্ট। প্রাক্‌-কলম্বিয়ান ও মেক্সিকান শিল্পের প্রভাবও লক্ষণীয়। ইদানীং নানান রকম মাটির পাত্র বা পুতুল তৈরীতে খুব উৎসাহী। কল্পনা এবং হিউমারের অপূর্ব সংমিশ্রণ এঁর কাজগুলিতে। কাঠের তৈরী নানা রঙের এলায়িত মূর্তিগুলিও আপন বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল।

উনিশশো দশ থেকে বাইশের মধ্যে যে সব ভাস্করদের দেখি তাঁরা অধিকাংশই ব্রনারের হাতে গড়া ছাত্র। এঁদের মধ্যে ভেসেল কাউসিনের খ্যাতি জগত-জোড়া। ফর্ম, স্পেস ও গঠন-পদ্ধতি নিয়ে দুঃসাহসিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা তাঁর। পুরণো ও নতুনের মধ্যে সমন্বয় সৃষ্টির এক অপূর্ব প্রয়াস তাঁর। এঁরই সমসাময়িক অন্যান্য ভাস্কররা হোলেন আধুনিক ডাচ ভাস্কর্যের প্রবক্তা। জেন মিফাউট, কর হুন্‌দ্‌, রুসেন্‌বার্গ, বেন গুন্‌টেনারের নামও উল্লেখযোগ্য। গুন্‌টেনারের শিল্পকর্মে হেনরি মুরের প্রভাব যথেষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

ডাচ ভাস্করদের মধ্যে কেনয়েলম্যানই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর কাজে সুররিয়েলেষ্টিক এলিমেণ্টের সাক্ষাৎ মেলে।

যুদ্ধের স্মৃতিস্তম্ভের জন্য নির্মিত মূর্তি।
এই মূর্তিটির স্রষ্টা জন রেদেকার।

হ্যান্‌স্ ভেরহুল্‌ষ্ট্‌, পল কন্‌নিং ও আঁদ্রে স্যালারের খ্যাতিও কম নয়। স্যালারের ভ্যান গগ মনুমেণ্টের কথা কেনা জানে!

য়্যাব্‌স্‌ট্রাক্‌ট্‌ ভাস্কর্যের নিদর্শন পাই লোট্টি ভ্যান

দের গাগ, আঁদ্রে ভোল্‌তেন ও চার্লস কার্‌স্‌টেনের কাজের মধ্যে।

প্রাণীজগতের নির্বাক পশুরাও অনেক সময় শিল্পীর শিল্পসৃষ্টির উৎস। পশুদের অবলম্বন ক'রে যাঁরা 'বিশেষ' হোয়েছেন তাঁদের মধ্যে নাম করা যায় গ্রা রয়ের, থেআ ভ্যানদের প্যান্‌ড্‌, চিত্রশিল্পী জেন গ্রয়েনেন্টাইন এবং হায়েন কোরমান।

সব শেষে আর একজনের নাম না করলে সত্যিই অন্যায় হবে। ডাচ ভাস্কর্যে সম্পূর্ণ এক নতুন বস্তুর ইনি আমদানি করেছেন। এঁর নাম শিন্‌কিচি তাজিরি। আমেরিকায় জন্ম। জাপানী শিল্পী। জাদ্‌কাইন ও লেগারের ছাত্র তিনি। ধাতুর তৈরী কাজগুলি তাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব ও ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনার বাহক।

এছাড়া আধুনিক ডাচ ভাস্করদের মধ্যে আরও চারটি প্রতিভার নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা হোলেন হেট্টেমা, কিলার্স্‌, ভোল্‌কার্স্‌ এবং পলিন এসেন।

পরিশেষে একটা কথা বলা যায় যে, যাঁদের প্রতিভাকে আশ্রয় ক'রে গত অর্ধ-শতাব্দীতে ডাচ ভাস্কর্যের এই বিস্ময়কর অগ্রগতি ও আত্মপ্রকাশ, আগামী দিনের সুন্দরতর সৃষ্টির পরশমণি তাঁদেরই হাতে।

রাস্তা—এই অভিনব ভাস্কর্যটির নির্মাতা হল্যাণ্ডের ভাস্কর্যশিল্পী বেন গ্লুন্‌টেনার।

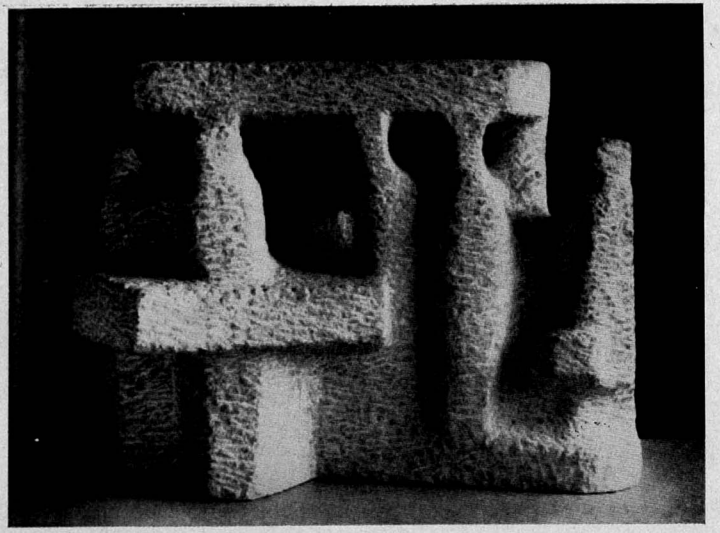

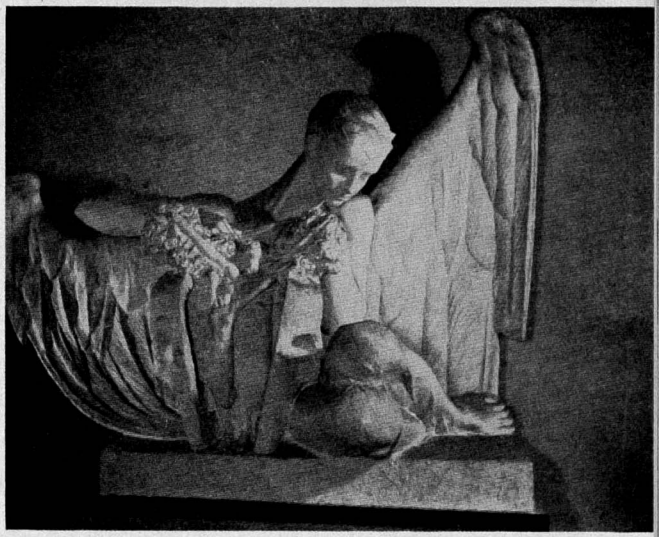

আইনার জন্‌সন-কৃত ভাস্কর্যটির নাম : বসন্ত।
আইসল্যাণ্ডের অগ্রগণ্য ভাস্করদের মধ্যে ইনি একজন।

আইসল্যাণ্ডের ভাস্কর্য | সুহাস সেন।

আইসল্যাণ্ড। উত্তর আটলাণ্টিকের নীল সমুদ্রে ভাসমান এই দেশটি শুধু আমাদের কাছেই নয়, ইউরোপের অনেকের কাছেই কৌতূহলের বস্তু। সত্যি কথা বলতে কি উনিশশো পঞ্চান্ন সালের নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আইসল্যাণ্ডীয় লেখক হ্যাল্‌ডর ল্যাকস্‌নেসই এ দেশের সরল সতেজ মানুষগুলিকে আমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। পরিচয়ের নিবিড়তায় আশ্চর্য হয়ে জানলাম যে তাঁরা শুধুমাত্র জীবন-সংগ্রামের অদম্য যোদ্ধাই নয়, সৃজনশীল শিল্প-স্রষ্টাও বটে।

রুচি জ্ঞানে বিশেষ উন্নতমান না থাকলে সমস্ত দেশটা এমন শিল্পপ্রেমিক হতে পারে না। প্রতিটি গৃহে, স্কুলে, হোটেলে এমনকি দেশের অভ্যন্তর ভাগে সুদূর খামারবাড়ীগুলিতে পর্যন্ত ছবি আর ভাস্কর্যের কিছু না কিছু নিদর্শন চোখে পড়বে। শিল্প-দ্রব্য এখানে লোক দেখানো ঐশ্বর্য নয়, মননের সহজাত বস্তু রূপেই তার অবস্থিতি।

অথচ ভাবতে আশ্চর্য লাগে বর্তমান আইসল্যাণ্ডীয় শিল্পী-গোষ্ঠী কোন সুসংগঠিত ধারাবাহিক দেশীয়

সুহাস সেন

লেখক হিসাবে সুপরিচিত না হোলেও এঁর লেখার সাবলীলতা ও স্বচ্ছতা লক্ষণীয়। আইসল্যাণ্ডের স্বল্প-পরিচিত ভাস্কর্য সম্পর্কে এই নিবন্ধটি শিল্প-রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হবে।

শিল্প-ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী নন। কারু শিল্পের কিছু প্রাচীন নিদর্শন আর উনবিংশ শতাব্দীর দুই তিনজন শিল্পীর কথা বাদ দিলে বর্তমান শিল্পী আর ভাস্কর গোষ্ঠীই আইসল্যাণ্ডের প্রথমতম সুসংগঠিত শিল্পী-দল। এই দিক দিয়ে বিচার করলে এদের শিল্প-ঐতিহ্য এখনও শৈশব উত্তীর্ণ হয়নি। যদিও এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে ত্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর আইসল্যাণ্ডীয় গাথা মধ্যযুগীয় ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সম্পদ।

আইসল্যাণ্ডীয় ভাস্কর্য শিল্পের অগ্রদূত হোচ্ছেন আইনার জন্‌সন (১৮৭৪-১৯৫৪)। দেশের মানুষ এবং সরকারও তাঁকে যোগ্য সম্মান দিয়েছেন। তাঁর সমগ্র শিল্প-সম্ভার একত্রিত কোরে সংগঠিত হোয়েছে আইনার জন্‌সন মিউজিয়াম। রেঁনেসা আন্দোলনের দ্বারা প্রভাবিত তাঁর রিলিফের শ্রেষ্ঠ কাজগুলির বিষয়বস্তু

অ্যাসমুণ্ডার স্ভাইন্‌সন-কৃত ভাস্কর্য।
ভাস্কর্যটির নাম : মেঝে পরিষ্কাররতা নারী।

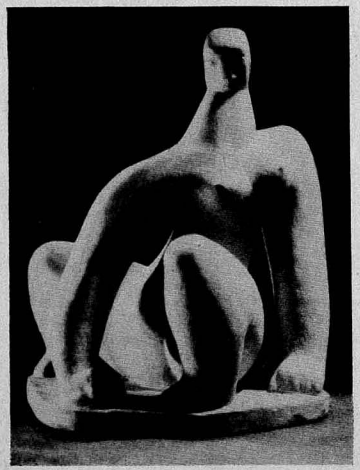

রূপক। নীতির প্রভাব তাঁর শিল্পকর্মে স্পষ্টতঃ প্রতীয়-মান। দেশীয় ভাবধারার চিহ্ন খুব অল্পই দৃষ্ট হয়। কয়েকজন তরুণ ভাস্করদের মধ্যে আইনার জন্‌সন-এর প্রভাব অপরিসীম। 'বিবেকের দংশন' তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। বিবেকের সীমাহীন যন্ত্রণার বহিঃ-প্রকাশের মূর্তিটি জীবন্ত। 'বসন্ত' তাঁর আর একটি প্রথম শ্রেণীর ভাস্কর্য।

আইসল্যাণ্ডের অধিবাসীরা এখনো আধুনিক শিল্প-ধারার সঙ্গে ব্যাপকভাবে পরিচিত নন এবং স্বভাবতঃই আধুনিক শিল্পরীতির সাফল্য সম্পর্কে সন্দিহান। কিন্তু আধুনিক শিল্পধারা গ্রহণ-বর্জনের এই দ্বন্দ্ব থেকে আইসল্যাণ্ডের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর গাডমেণ্ডার আইনারসন (জন্ম : ১৮৯৫) নিজেকে মুক্ত রাখতে পেরেছেন। তিনি পথ খুঁজে নিয়েছেন গ্রীসীয় শিল্পের ধ্রুপদী ঐতিহ্যের ধারায়। গ্রীসীয় শিল্পের ধারায় তিনি সরকারী বহু স্তম্ভ, প্রতিকৃতি এবং সেরামিকের শিল্প-দ্রব্য সৃষ্টি করেছেন। কোলবার্গ এবং ফিনিশীয় ও সুইডিশ শিল্পী আডালটোমেন ও মিলো-এর প্রচুর প্রভাব তাঁর উপর লক্ষ্য করা যায়। আইনারসন লাভা দিয়েও মূর্তি তৈরী করেন। উনিশশো বাহান্ন সালে হেলসিংকির অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে তাঁর তৈরী তামার মূর্তি দুইটি সমস্ত পৃথিবীর শিল্পরসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথম জীবনে আইনারসন ছিলেন খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে তিনি ভাস্কর্যে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বলেন যে ভাস্কর্যের মধ্যেই তিনি খুঁজে পেয়েছেন জীবনের চরম আনন্দের উৎস। 'শেষ জনতা' (১৯৪৭) নামে ভাস্কর্যটি আইনারসন-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকর্ম। জীবনের শেষ সম্বলটুকু পণ করেও যারা বাঁচার লড়াই চালিয়ে যায় সেই অমর মানবাত্মার অভিব্যক্তিকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন এই শিল্পসৃষ্টিতে।

আর একজন প্রতিষ্ঠিত ভাস্কর অ্যাসমুণ্ডার স্ভাইন্‌-সন (জন্ম : ১৮৯২।) শিল্পরীতিতে বৈপ্লবিক চিন্তার বাহক হিসাবে তিনি ক্রান্তিকালের শিল্পী হিসাবে পরিচিত। কৃষকের সন্তান। পিতামাতা চেয়েছিলেন পৈতৃক কর্মে নিযুক্ত রাখতে। তাঁদের এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রাম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হয়েছে শিল্পীকে। স্ভাইন্‌সন মনে করেন যে জগত ও

আইসল্যাণ্ডের বিখ্যাত ভাস্কর সিগুরজন জন্‌সন
রূপায়িত ভাস্কর্যের নিদর্শন। নাম : বিড়ালসহ নারী।

পরিবেশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শিল্পধারার পরিবর্তনও অবশ্যম্ভাবী। তিনি বলেন তাঁর সৃষ্ট শিল্পসম্ভার কখনও তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি হতে পারে না। শিল্প জনতার জন্য—জনতাই শিল্পের মালিক। স্বীয় উদ্যানে স্থাপিত তাঁর সৃষ্ট অসংখ্য মূর্তিগুলি দেখে মনে হয় যেন এ-ধরিত্রীর সমস্ত বেদনাকেই তারা বহন করছে। তাঁর স্টুডিওতে রক্ষিত প্রথম যুগের একটি শিল্পকৃতি ডেসপিও-কে স্মরণ করিয়ে দেয়। শিল্পী নিজে প্যারীতে ডেসপিও এবং বুর্দেল-এর সতীর্থ ছিলেন। বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্পরীতির বিভিন্ন পর্যায়গুলি প্রবহমান আর্‌চিপেঙ্কো, জাদ্‌কিন আর মুর-এর শিল্পধারার খাতে। শিল্পকার্যের মাধ্যম হিসাবে তিনি কাদামাটি, লোহা, তামা এবং কাঠ প্রভৃতি সমস্ত কিছুই স্বচ্ছন্দে ব্যবহার করেন। স্ভাইন্‌সন-এর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য 'মেঝে পরিষ্কাররতা নারী' স্পষ্টতঃই আধুনিক শিল্প-রীতির প্রতিনিধি-স্থানীয়। এ-ছাড়া উত্তর আইস-ল্যাণ্ডের কুরেইরি চার্চে কাঠ খোদাই-এর কাজ তাঁর আশ্চর্য প্রতিভার স্বাক্ষর।

বিখ্যাত ভাস্কর সিগুরজন অল্‌ফাসন-এর 'বিড়ালসহ মহিলা' আইসল্যাণ্ডীয় ভাস্কর্য-শিল্পের এক বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ নিদর্শন। সমস্ত শিল্পকর্মটির মধ্যে প্রাচীন যুগের শিল্পকলার প্রভাব লক্ষণীয়।

একথা ঠিক যে মৌলিক কোন নতুন শিল্পরীতি আইসল্যাণ্ডীয় ভাস্কর্যে খুঁজতে গেলে ব্যর্থ হতে হবে, কেননা, প্রথমেই বলা হয়েছে এদেশের শিল্প-ঐতিহ্যের শৈশব এখনও উত্তীর্ণ হয়নি। এদেশের ভাস্কর্য-শিল্পের ধারা ও রীতির সঙ্গে অন্য স্ক্যাণ্ডিনেভিয় তথা ইউরোপীয় দেশের রীতির কোন পার্থক্যই নেই। কিন্তু সারা দেশ জুড়ে এঁরা যে ভাবে শিল্প আর শিল্পীর প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগের পরিচয় দিচ্ছেন তাতে সন্দেহাতীত ভাবেই একথা বলা যায় যে আইসল্যাণ্ডীয় ভাস্কর্য-শিল্পের স্বর্ণ যুগ অদূর ভবিষ্যতেই দেখা দেবে।

এদেশের প্রতিটি মানুষের শিল্প-অনুরাগ সম্পর্কে হাল্‌ডর ল্যাকস্‌নেসের একটি ছোট্ট লেখা এখানে উদ্ধৃত করা হোল : একবার রেইক্‌জাভিক শহরে এক প্রদর্শনীতে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। লোকটি প্রদর্শনী কক্ষে ঢুকেই হঠাৎ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আস্তে আস্তে নিজের চশমাটি খুলে উচ্ছ্বসিত কান্নায় ফেটে পড়লেন। আর বিড় বিড় করে বলতে লাগলেন—'ভগবানের এ এক মহান আশীর্বাদ'। আইসল্যাণ্ডের প্রথম শিল্পীদল এইরকম অভ্যর্থনাই লাভ করেন দেশবাসীর কাছে থেকে।

প্ল্যাস্টিক উপকরণসহ
বেলজিয়ান ভাস্কর
জর্জেস ভ্যানটংগেরলু।

প্যারিস কি তবু মনে রাখে ?

[বেলজিয়ান ভাস্কর ভ্যানটংগেরলু সম্পর্কে প্রবন্ধটি লিখিত।]

"বুঝলে হে ইয়ংম্যান, আমরা যতই কেন না মডার্ন আর্ট বলে কপচাই, আমাদের আর্ট মোটেও মডার্ন বা সমসাময়িক কিছুই নয়। এখনও আড়াই হাজার বছর পিছনে আছি আমরা। এটাই হল মোদ্দা কথা। নিজে থেকেই বুঝবে, থাকো কিছুদিন প্যারিসে",—বলেছিলেন আমাকে বৃদ্ধ জর্জেস ভ্যানটংগেরলু, আলাপ আলোচনার মধ্যে। অনেক সাধ্যসাধনার পর মঁপারনাসের নিকটবর্তী 'ইমপাশে রু দ্রুঁয়া'তে তাঁর ছোট্ট এতেলিয়র-এ প্রবেশাধিকার পেয়েছিলাম। পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে, নিতান্ত একলা লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে, আপনমনে বিভিন্ন নতুন পথে শিল্প সৃষ্টি এখনও করে চলেছেন এই বিখ্যাত শিল্পী। এখনকার প্যারিসের শিল্প জগৎ ভুলে গেছে এঁকে। ভ্যানটংগেরলুর সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথা পরে কয়েকজন শিল্প-সমালোচক ও শিল্পীদের কাছে উল্লেখ করেছিলাম। তাঁরা অনেকেই যেন আকাশ থেকে পড়লেন। "উনি কি এখনও জীবিত আছেন ?" এমন প্রশ্ন অনেকেই করেছিল খোদ প্যারিসেই, অন্য স্থানের কথা ছেড়েই দিলাম। এই প্যারিসেই তিনি সশরীরে আজও বেঁচে আছেন। শুধু আছেন তা নয়, এখনও ভাস্কর্যে তিনি নতুন শিল্প সৃষ্টিতে নিমগ্ন। সে খবরও কেউ রাখে না। কিন্তু ভ্যানটংগেরলুর সঙ্গে যে চার ঘণ্টা তাঁর এতেলিয়র-এ কাটিয়েছিলাম, প্যারিসের অন্যান্য বহু স্মৃতির মধ্যে মনে তা উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

ভ্যানটংগেরলু ভাল ইংরিজী বলতে পারেন না। ইংরিজীর সঙ্গে ফরাসী-বেলজিয়াম মিশিয়ে ভাবভঙ্গী দিয়ে আমার সঙ্গে যে আলোচনা করেছিলেন তা বুঝতে কিন্তু আমার খুব অসুবিধা হয়নি। সেইজন্যই মডার্ন আর্ট সম্বন্ধে উপরে উল্লিখিত তাঁর কথা আমি কিছু ভুল বুঝে, বাড়িয়ে লিখিনি।

ইয়োরোপের শীতকালের স্যাঁতসেতে এক দুপুরে হাজির হয়েছিলাম ভ্যানটংগেরলুর ঠিকানায়। আগে থেকেই ঠিকানা জোগাড় করেছিলাম তাঁর প্রিয় এক পরিচিত ব্যক্তির নিকট থেকে। বুলভার মঁপারনাসের "লা সিলেক্ত্" কাফে ছিল আমাদের আড্ডার বা জমায়েৎ হবার কেন্দ্র। সেখান থেকে হাঁটতে হাঁটতেই চলে গিয়েছিলাম ইমপাশে রু দ্রুঁয়ার কানা-গলিতে। ঠিকানা খুঁজে পাবার পরও কয়েকতলা বাড়িটার কোন তলার কত নম্বর ঘরে ভ্যানটংগেরলুর এতেলিয়র তা খুঁজে বার করতেও সময় লেগেছিল। ওই বাড়ির অনেকেই বলতে পারল না তাঁর কথা, যেন নামই শোনেনি কোনদিন। উঠোনে তিন চারটি ছোট ছেলেমেয়ে খেলছিল, ওদের জিজ্ঞাসা করাতে সঠিক স্থান নির্দেশ করেছিল। পাশাপাশি, ছোট ছোট আরও সব খুপরী, যা শিল্পীদের মর্যাদাদানের জন্যই বোধহয় 'এতেলিয়র' নামে পরিচিত। ভ্যানটংগেরলুর এতেলিয়র-এর দরজায় দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ ধরে টোকা মারলাম। কোন সাড়াশব্দ নেই। দরজায় কান পেতে ভিতরে কেউ আছে কিনা বা বাঁশির আওয়াজ শুনতে পাই কিনা তারও চেষ্টা করলাম। আমি আগেই শুনেছিলাম, এই শিল্পীর কাছে কেউ দেখা করতে গেলে উনি তা পছন্দ করেন না এবং দরজাও খোলেন না। তাঁর একটি উল্ভট খেয়ালও আছে। দরজায় টোকা পড়লে অনেক সময় বাঁশি বাজাতে শুরু করেন, যেন কোনো আওয়াজ শুনতেই পারছেন না এবং বাঁশির আওয়াজ মানে "দরজা খুলব না, কেটে পড়"। কোন সাড়াশব্দ না

সলিল ঘোষ

ভাস্কর্য, স্থাপত্য এবং চিত্রশিল্প সম্পর্কে প্রবন্ধাদির রচনাকার হিসাবে সুখ্যাত। এই প্রবন্ধটি 'সাপ্তাহিক দেশ' পত্রিকার ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৯৬৮ তারিখের সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত করা হোল। লেখাটির উৎকর্ষতা ছাড়া প্রতীচ্যের ভাস্কর্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা জন্যেও এই সংকলন।

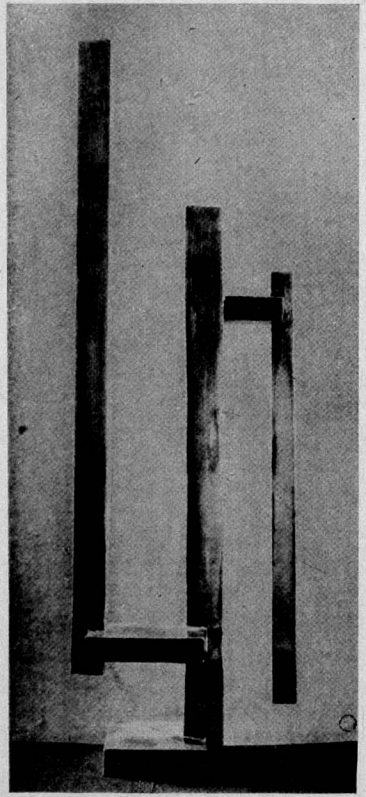

ভ্যানটংগেরলু-কৃত ভাস্কর্যটির নাম : স্পেস-এর রূপায়ণ।

পেয়ে আরও কিছুক্ষণ চেষ্টা করে, হতাশ হয়ে নীচে নেমে এলাম। উঠোনে দাঁড়িয়ে এদিক-সেদিক দেখছি, একজন ভদ্রলোক চত্বরে ঢুকলেন। হাতে একটা বোতল। দেখেই মনে হল, প্যারিসের পঞ্চাশ হাজার শিল্পীর অন্যতম কেউ নিশ্চয় হবে। জিজ্ঞাসা করলাম ভ্যানটংগেরলুর কথা। নিজের পরিচয়ও দিলাম আর হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম ভদ্রলোক ইংরেজী জানেন তার প্রমাণ পেয়ে। আমাকে বেশ আপ্যায়ন করেই আহ্বান জানালেন একতলায় তাঁর নিজের এতেলিয়র-এ আসতে,—"ভ্যানটংগেরলুকে দিয়ে দরজা খোলান অত সোজা ব্যাপার নয়।" বিশেষ পরিচিত ও বন্ধু ব্যক্তিরা আসার আগে একটা কার্ড লিখে পূর্বে তাকে জানিয়ে রাখলে তবেই দরজা খোলেন।

ভদ্রলোকের এতেলিয়র-এ গিয়ে শিল্পীর পরিচয় পেলাম। জগদ্বিখ্যাত না হলেও গুণী শিল্পী মার্ক স্টার্লিং। আলাপ করিয়ে দিলেন তাঁর তরুণী স্ত্রী ও প্রথমপক্ষের অসুস্থা কন্যার সঙ্গে। বেশ লাগল এই স্টার্লিং পরিবারকে। শিল্প নিদর্শনের নমুনাও দেখালেন। মিসেস স্টার্লিংও শিল্পী, এককালে মার্কেরই ছাত্রী ছিল। ছবির ফটো, পুরনো প্রদর্শনীর সব ক্যাটালগ, সুভেনীর ইত্যাদি দিলেন, স্বাক্ষর করে। ছোট্ট

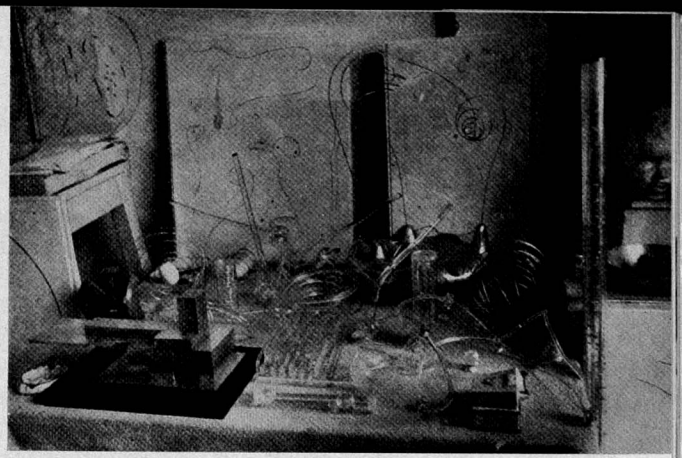

ভ্যানটংগেরলু-কৃত রচনার বিশিষ্ট নিদর্শন।

খুপরীতে স্টুডিও ছাড়াও একটা পুরো সংসার, কিন্তু তবুও কি সুন্দরভাবে তা রাখা। মার্ক বল্লেন—"ভ্যানটংগেরলু দুপুরে খেতে বেরিয়ে যান অনেক সময়, এতক্ষণে নিশ্চয় ফিরেছেন। এবার গিয়ে চেষ্টা করতে পার।" ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার গেলাম ভ্যানটংগেরলুর দরজায় টোকা মারতে। এবার কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে দরজা খুলল। বেঁটেখাটো শক্তসামর্থ বৃদ্ধ, দরজা অল্প একটু ফাঁক করে বিদেশী লোক দেখে একটু যেন আশ্চর্য হলেন। সূক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে কিছুক্ষণ যেন আপদ মস্তক নিরীক্ষণও করলেন, কিছুটা সন্দেহ বোধহয় ছিল সে দৃষ্টিতে। তাঁর পরিচিত ব্যক্তির নামোল্লেখ করে নিজের পরিচয় দিলাম, তাঁর কাছে আসার উদ্দেশ্য জানালাম। ভিতরে আসতে বললেন। ছোট এতেলিয়র-এর চারি দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম ভিতরে ঢুকেই। নানাপ্রকার জিনিসে ঠাসা এই ছোট্ট খুপরীটি, কিন্তু সব কিছু অত্যন্ত ছিমছাম গোছানো। একদিকে প্লাস্টিকের তৈরী তাঁর সব রচনার নিদর্শন। বিভিন্ন সময়ের এইসব শিল্পকর্মের কিছু টেবিলের উপর কিম্বা শূন্যে ঝোলান। জানালার সামনে টেবিল, পাশে শেলফ। একপাশে একটি চামড়ায় মোড়া ধুমসো সোফা, তাঁর বসার স্থান। এককোণায় ছোট "কিচেন" এলাকা ও পানীয়ের সরঞ্জাম রাখার ব্যবস্থা। ওরই পাশে, কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠে, ছোট "মেজানিন ফ্লোর", ওঁর শোবার স্থান। মোটেও অগোছালো নয় কোনো কিছু, বেশ অন্তরঙ্গ নিরিবিলি আবহাওয়া এই এতেলিয়রে। ভাষার দরুণ আলাপ-আলোচনার অসুবিধা প্রচুর। তবুও প্রথম পরিচয়ের আড়ষ্টতা কেটে যাবার পরই স্মিতহাস্যে আন্তরিকতার সঙ্গে বলেছিলেন,—"তুমি আসাতে আমি খুশীই হয়েছি, কারণ তুমি ওরিয়েন্তাল। তা না হলে এখানে এসে কেউ আমাকে বিরক্ত করে তা আমি চাই না। ওরিয়েন্তালদের আমার ভাল লাগে, ভাল লাগে ওদের ফিলসফি। কিছু কিছু চর্চাও করেছি। সেসব ফিলসফি দৈনন্দিন জীবনে পালন করা বা মেনে চলা দুঃসাধ্য, কিন্তু তবুও এমন কিছু একটা আছে ওর মধ্যে, যা আমাদের ইয়োরোপে পাওয়া যাবে না।"

চার ঘণ্টা ধরে নানান কথা বলেছিলেন, নিজের কাজকর্ম খুঁটিনাটি সব যন্ত্র সহকারে দেখিয়েছিলেন। বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি কি করতে চান, কী তাঁর উদ্দেশ্য। প্লাস্টিক দিয়ে তৈরী ভ্যানটংগেরলুর ভাস্কর্যকে "উচ্চ-গাণিতিক ভাস্কর্য" বলা হয় এমন কথা আমি শুনেছিলাম। এসবের তত্ত্বকথা সম্বন্ধে বিশদভাবে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করি অথবা তার সার্থকতা

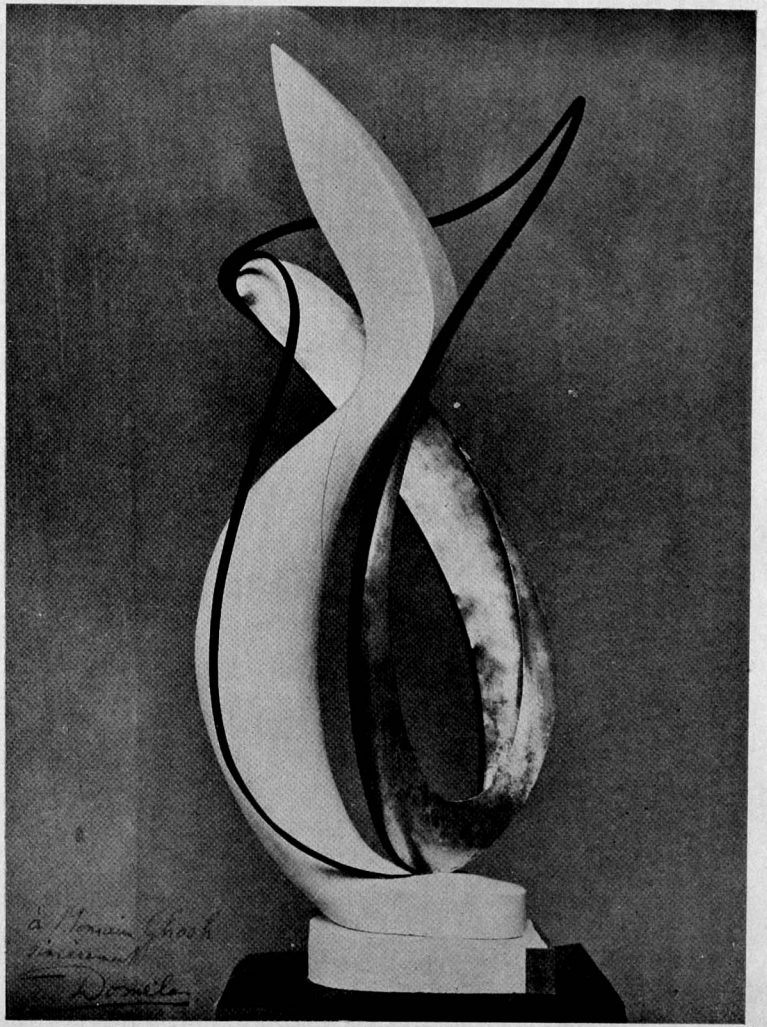

শিল্পক্ষেত্রে নতুন মতবাদ ও শিল্পরীতির প্রচলনকারী ভ্যানটংগেরলুর সমসাময়িক ভাস্কর দোমেলার একটি ভাস্কর্য।

সম্বন্ধে তর্ক তুলি, সে জ্ঞান আমার নেই আর আমি তা কখনও করতেও চাই না। আর শিল্পীদের সঙ্গে তাঁদের আর্টের তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার মত বোকামীও বোধহয় আর কিছু নেই। সব শিল্পীই তাঁদের কাজের বিষয়ে একটা তত্ত্ব বা একটা ব্যাখ্যা খাড়া করেন। নিজের দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী তাঁরা আশাও করেন যে সকলেই তাঁদের সেই দৃষ্টিভঙ্গী, সেই যুক্তি, সেই তত্ত্ব মেনে নেবে। বহু সময়, লক্ষ্য করেছি এই সব যুক্তি, তত্ত্ব বা আইডিয়া অত্যন্ত উদ্ভট। জোর করে বানানো, অসংলগ্ন বক্তব্যের উপর স্থাপিত। সে নিয়ে আলোচনা করা চলে না। ছবি যদি ভাল লাগে, তো বিশ্বাস করে নাও সব কথা। বিশ্বাসে মিলয়ে বস্তু—তর্কে বহুদূর। একথাটা শিল্প্ক্ষেত্রেও, বিশেষ করে আধুনিক চিত্রকলার ডামাডোলে খুবই খাটে।

অত্যন্ত সাধারণ কৌতূহল নিয়ে গিয়েছিলাম শিল্পী ও তাঁর কাজ দেখতে। যখনই কোন প্রশ্ন করেছি বৃদ্ধ-শিল্পী অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে তা বোঝাবার চেষ্টা করেছেন ইংরাজী ভাষা সামান্য জানা সত্ত্বেও। চিঠির খামের উপরে বীজগণিতের সমীকরণের মাধ্যমে তাঁর প্ল্যাস্টিকের একটি রচনার অন্তর্নিহিত রহস্য দেখাবারও প্রচেষ্টা করেছেন। বলাবাহুল্য, ভাষার অসুবিধায় অনেক কিছুই আমার বোধগম্য হয়নি। তবুও কখন যে কেমন-ভাবে চার ঘণ্টা পার হয়ে গেল, তা টেরই পাইনি। অবশ্য আমি সর্বদাই আশা করছিলাম, হঠাৎ হয়ত বলবেন—"ওহে, এবার কেটে পড়, অনেক সময় নষ্ট করেছ।"

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, প্ল্যাস্টিক উপকরণ নির্বাচন করার কী কারণ। ঘরে একধারে প্লাস্টিক গরম করার উনুনের কাছে গিয়ে বল্লেন, "তোমাকে বোঝাচ্ছি এর কারণ। কিভাবে এই উপকরণ দিয়ে কাজ করি, তাও বুঝতে পারবে।" হাতে একটা প্ল্যাস্টিকের টিউব নিয়ে বল্লেন, "আমার কাছে এই টিউব মোটেই প্রাণহীন নয়, অত্যন্ত সজীব। আমাদের মধ্যে অনুভূতির আদানপ্রদান হয়। আমাকে সে ভাল বোঝে। আমি কি করতে চাই, ঠিক সেই মত সে নিজেকেও প্রস্তুত করে নেয়। এবার দেখ, একটু গরম করে আমি একে বেঁকাব। আমি একে যে আকার দিতে চাই, হয়ত সে-পরিমাণ গরম এখনও হয়নি। তা না হলে এই উপকরণটি তখনই আমাকে বলবে—'এখনও কিছু কোরো না, আমি প্রস্তুত নই। আরেকটু অপেক্ষা কর।' আমার সঙ্গে প্ল্যাস্টিকের এই বোঝা-পড়া, এই অন্তরঙ্গতা আছে। সেই জন্যই এই উপকরণ দিয়ে আমি কাজ করি। আমার কাছে এটা কোন

ভ্যানটংগেরলুর মতই
ভাস্কর্যে নতুন পথের পথিকৃতদের
একজন দোমেলা। তাঁর অপর
একটি অভিনব ভাস্কর্য।

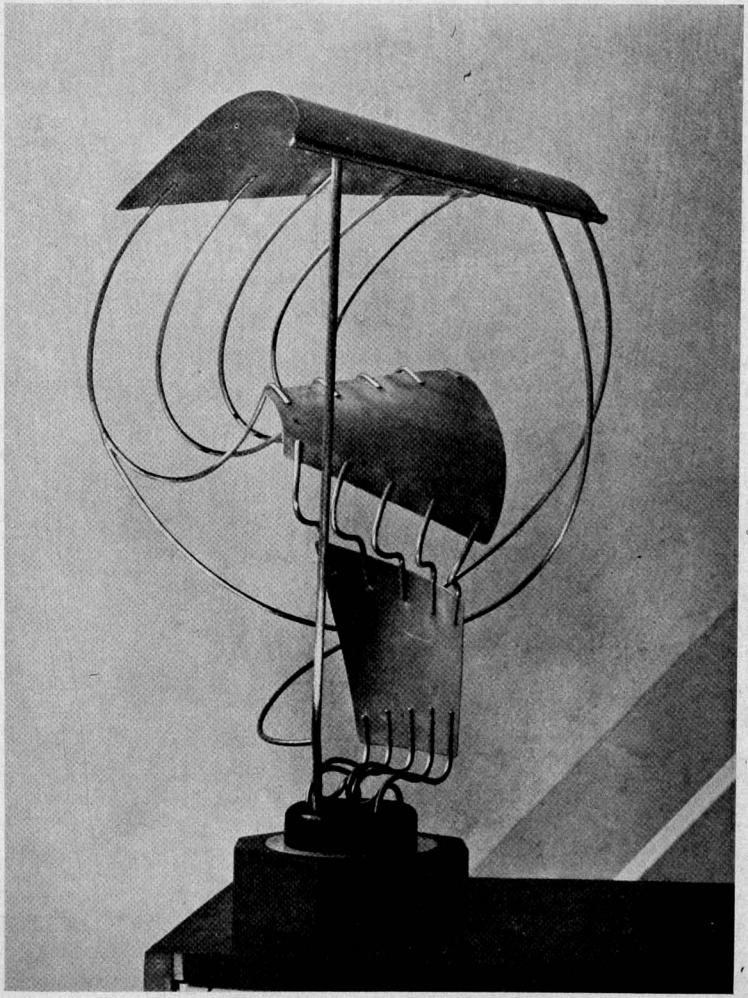

জড়পদার্থ নয়, অত্যন্ত সংবেদনশীল বস্তু, এমনকি মানুষের চাইতেও।"

আবার যখন জিজ্ঞাসা করেছিলাম,—"শুনেছি, আপনি নাকি লোকজন, অন্যান্য শিল্পীদের সঙ্গে মেলামেশা পছন্দ করেন না, এর কি কারণ?" ভ্যানটংগেরলু গিয়ে বসলেন তাঁর সেই ধুমসো সোফায়। নানান্ কথা বলে গেলেন। তাঁর শিল্পী জীবন, প্যারিসের শিল্প জগৎ। অর্ধেকই বুঝিনি, কিন্তু সারাংশ আঁচ করেছিলাম। প্যারিসের আর্টের জগতে আজ যে পাগলামি ও হন্যে-পনা চলছে, তার সঙ্গে উনি তাল রাখতে পারবেন না। কাফেতে গিয়ে আড্ডা মারা, এখানে সেখানে গিয়ে মেলা-মেশা করা, কোন প্রদর্শনীর উদ্বোধনের দিনে নিজেকে হাজির করে জাহির করা ইত্যাদিতে তাঁর প্রয়োজন নেই। সর্বত্র রয়েছে কৃত্রিমতা, স্বার্থপরতা। কোন প্রকার মানবিক সম্পর্ক নেই, কোথাও আন্তরিকতা নেই। সব কিছু চলছে ভাসা ভাসা, সাময়িক ফ্যাশন, রীতি চাহিদা অনুযায়ী, হৈহৈ হুজুগ আর ভণ্ডামি, উত্তেজনা, যতরকমের ষড়যন্ত্র আর্টের নামে। ওঁর প্রয়োজন নেই এসবের। বহু যুগ উনি কোনো প্রদর্শনীই করেন নি, করতেও চান না। ওঁর অত্যন্ত সহৃদয় বন্ধু গুণগ্রাহী ম্যাক্স বিল (কংক্রীট শিল্পীগোষ্ঠীর অন্যতম প্রধান) স্থপতি, শিল্পী, ডিজাইনার, টাইপোগ্রাফার ও আরও অনেক কিছু। মাঝে মাঝে আসে, জোর করে দু-চারটি রচনা নিয়ে যায় বিভিন্ন সব প্রদর্শনীতে দেখানর জন্য। সেটাই যথেষ্ট। লোকে ওঁর কাজ দেখুক বা না দেখুক, বুঝুক বা না বুঝুক, কিনুক বা না কিনুক, সে-সবের আর কোনো মূল্যই নেই ওঁর কাছে।

একনাগাড়ে অনেক কথাই উনি বলে গেলেন অকপটে। কিছুক্ষণ নীরবতার পর আবেগজড়িত কণ্ঠে বললেন—"আমি যে রুটিওয়ালার কাছ থেকে রোজ রুটি কিনি গলির মোড়ে, তার দোকানে একদিন যদি না যাই, পরদিন সে প্রশ্ন করে 'মঁসিয়ো, কাল রুটি নিতে আসনি, তোমার শরীর কি ভাল ছিল না?' রুটিওয়ালার এই প্রশ্ন, এই মানবিক সম্পর্ক আমার কাছে অধিক মূল্যবান প্যারিসের শিল্প জগতের ওই সব 'ফ্যান-ফেয়ার'-এর চাইতে। তাই নিজের মনে একলা কাজকর্ম করি। অসীম তৃপ্তি ও প্রশান্তি আমার মনে। শিল্পীর জীবনে এটা কি একটা খুব বড় কথা নয়? তুমি কি বল?"

একবার মনে হয়েছিল এই শিল্পীর মনের মধ্যে রয়েছে জগৎ সম্বন্ধে কিছু তিক্ততা, হয়ত কিছু অভিমান। যে শিল্পী এখনকার শিল্পজগতে এককালের পথিকৃৎ, নতুন পথে যাবার দুঃসাহস নিয়ে সংগ্রাম করেছিলেন, আজ

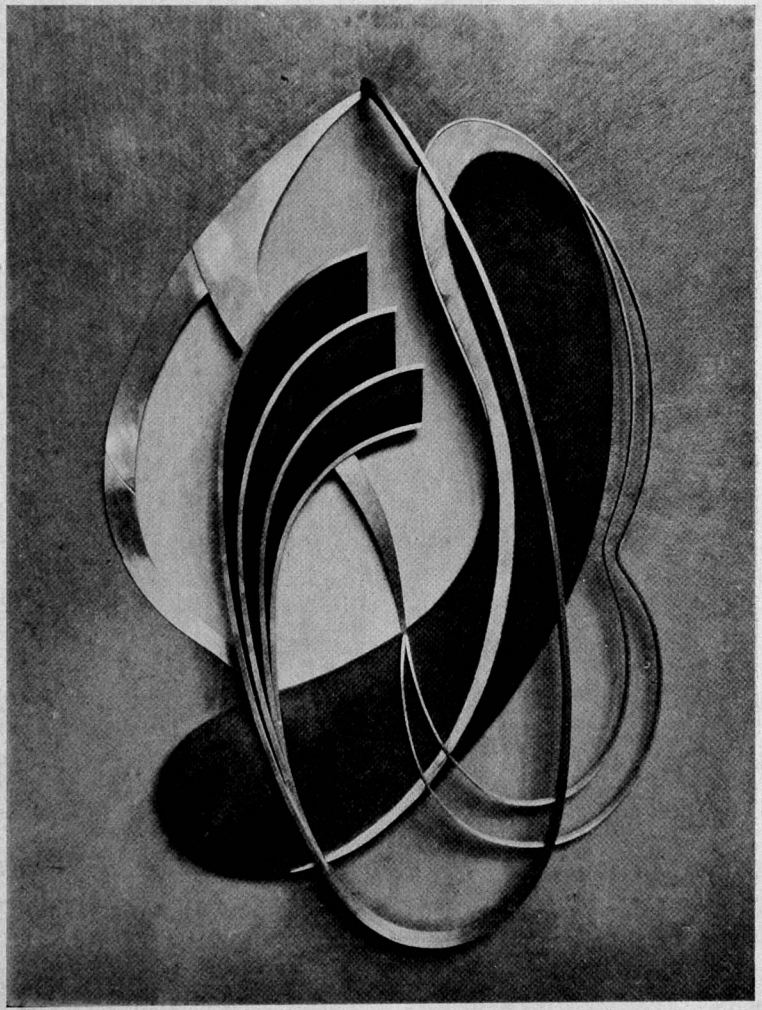

দোমেলোর বা-রিলিফের
কাজ। প্রসঙ্গত স্মরণীয়
বাংলা দেশের প্রখ্যাত মহিলা
শিল্পী আমিনা আমেদ এই ভাস্করের
নিকট শিক্ষা লাভ কোরেছিলেন।

বৃদ্ধ ভ্যানটংগেরলুর আর কোন প্রয়োজন নেই। হয়ত পেয়েছেন অবহেলা, তাই এই বিরূপতা। শুনেছি তাঁর স্ত্রী বর্তমান, ছাড়াছাড়িও হয়নি। কিন্তু স্ত্রীও যে সঙ্গে থাকেন, এ তাঁর পছন্দ নয়। একলা থেকে থেকেই বোধ-হয় তাঁর এই মনোভাব। কিন্তু পরে প্যারিসের আর্ট-জগতের সঙ্গে আরেকটু ঘনিষ্ঠ হবার পর হৃদয়ঙ্গম করেছিলাম ভ্যানটংগেরলুর কথার যাথার্থ। এই উক্তি কোন অভিমানের কথা নয়, শিল্পীর বিচক্ষণতারই পরিচয়।

বেরিয়ে এসে রাস্তায় চলতে চলতে ভাবছিলাম এই বেলজিয়ান শিল্পীর কথা। আজ বহুকাল ধরে ইনি প্যারিসেরই বাসিন্দা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় হল্যাণ্ডে থিও ভ্যান ডোয়েস্‌বার্গ এবং তাঁর সাময়িক পত্র "স্টাইল্" শিল্পক্ষেত্রে এক নতুন মতবাদ ও শিল্পরীতি প্রচলন করেন। এই দলের মধ্যে ছিলেন ডাচ শিল্পী মণ্ড্রিয়ান্, যিনি "নিওপ্লাস্‌টিসিজম্" কথাটি ব্যবহার করেন। ত্রিস্তর-মাত্রিক আয়তনকে, নতুন মৌল প্ল্যাস্টিক গুণসম্পন্ন, 'সমতলে' সংকুচিত করা হল। মণ্ড্রিয়ান "ইলুশন" সৃষ্টির দ্বারা প্রতিচ্ছবি অঙ্কন সর্বপ্রকারে পরিত্যাগ করলেন। মৌলিক তিনটি রঙ, শুধু খাঁটি লাল, নীল, হলদের সমতল, তাদের পারস্পরিক সম্বন্ধ ও ব্যালান্স। ভ্যানটংগেরলুও ছিলেন এই গোষ্ঠীর তরুণ শিল্পীদের অন্যতম। ১৯১৮ সালে, তাঁর সব ফাঁপা প্ল্যাস্টিকের কাজ, 'প্রিজম্', বিভিন্ন আকারের "স্ল্যাব্" ইত্যাদির দ্বারা প্রমাণ করলেন যে, তদানীন্তন সমসাময়িক চিত্রকলার মতই, ভাস্কর্যও একটি মাত্র দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার বস্তু বলে সীমাবদ্ধ করলে চলবে না। ডোয়েস্-বার্গের নেতৃত্বে এই গোষ্ঠী পরবর্তী কালে পাশ্চাত্য শিল্পকলায়, স্থাপত্যে, ভাস্কর্যে, ডিজাইনে, সর্বক্ষেত্রে এমনকি বিজ্ঞানেও কি বিপুল প্রভাব বিস্তার করেছিল, তা আজ আর কারো অজানা নেই। "স্টাইল" পত্রিকা-গোষ্ঠীর আরেকজন শিল্পী ডোমেলা-র সঙ্গেও পরে আলাপ হয়েছিল প্যারিসে। ইনি "নন্-অবজেক্‌টিভ আর্ট"-এর অন্যতম পথিকৃৎ। আজকের প্যারিসে এঁদের

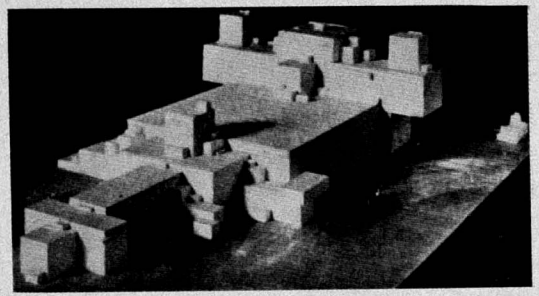

বিভিন্ন আকারের
'স্ল্যাব' : জর্জেস ভ্যানটংগেরলুর
ভাস্কর্যের বিশিষ্ট নিদর্শন।

প্রয়োজন যেন ফুরিয়েছে, এককালে নতুন পথ প্রদর্শন করলেও বা। আজ আরও কত শিল্পী নতুন নতুন দিকে প্রবাহিত করছে শিল্পকলার ধারাকে। তাই বৃদ্ধ ভ্যানটংগেরলুর কথা আজ প্যারিসের আর্ট জগৎ ভুলে গেছে। কিন্তু ওই শহরেরই এক নিভৃত কোণায় এখনও চলছে এই শিল্পীর সাধনা, নতুন কিছু পাবার আশায় নতুন কিছু দেবার আশায়। এই পথ খোঁজার শেষ নেই।

পথে চলতে চলতে ভ্যানটংগেরলুর আরেকটা ব্যবহারও মাথায় ঘুরপাক্ খাচ্ছিল। বেশ হুঁসিয়ার লোক বলেই মনে হয়েছিল ওঁকে, ভোলাভালা শিল্পী নন্। প্যারিসে আমি অনেক শিল্পীদের সঙ্গে দেখা করেছি, যাদের সকলেই খুশী হয়ে, এক বিদেশীকে স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কিছু দিয়েছে। কেউ কোনো স্কেচ্-এ সই করে, কেউ নিজের ফটো, কিম্বা রচনার ফটো, প্রদর্শনীর ক্যাটালগ ইত্যাদি। ভ্যানটংগেরলুর কাছেও এইরকম কোন স্মৃতিচিহ্ন চেয়েছিলাম। রচনার ফটো ত দূরের কথা, এমনকি অটোগ্রাফও দিতে রাজী হলেন না। এ ধরণের সেন্টিমেন্ট উনি মোটেও বরদাস্ত করেন না তা বেশ বোঝা গেল। কিন্তু আমিও নাছোড়বান্দা, স্মৃতিচিহ্ন নেবই। যে খামের উপর বীজগণিতের সমস্যা লিখে দেখিয়েছিলেন, "এটা রাখলাম" বলে পকেটে পুরলাম। বারণ না করলেও, সন্তুষ্ট যে হলেন না, তা বুঝেছিলাম। আর ভ্যানটংগেরলুর প্রসঙ্গ শেষ করার আগে, এটাও বলে রাখি যে প্রথমবার উনি ঘরে থাকলেও, ইচ্ছা করেই দরজা খোলেন নি।

* সাপ্তাহিক 'দেশ' (১৬ অগ্রহায়ণ, ১৩৬৮) থেকে পুনর্মুদ্রিত।

দৃষ্টিকোণ

হেনরী মূর

প্রতীচ্যের আধুনিক ভাস্কর্যে
হেনরী মূর-এর অবদান
সুবিদিত। ভাস্কর্য সম্পর্কে
তাঁর চিন্তাধারার পরিচয়-বাহী
এ-প্রবন্ধ। অনুবাদক : শঙ্কর দাশগুপ্ত।

কোনো একজন চিত্রকর বা ভাস্করের পক্ষে তার নিজের কাজ সম্পর্কে লেখা বা বলা দুটোই সম-পরিমাণ ভ্রান্তিজনক। কেননা তা তার কাজের উদ্দীপনাকে স্বতই ব্যাহত করে। সুবলয়িত যুক্তির আকারে বক্তব্য প্রকাশের চেষ্টা প্রায়শঃ তাত্ত্বিক নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠাস্বরূপ। সেই শিল্পী বা চিত্রকরের সৃষ্টিশীল কাজের ক্ষেত্রেও অনুরূপভাবে বুদ্ধিরই দেখি দৈনন্দিন দৈন্য।

পারতপক্ষে দেখা যায় যুক্তিহীন স্বজ্ঞা ও অবচেতন মন আপন প্রভাব বিস্তার করা ছাড়াও শিল্পীর সচেতন মানস ক্রীয়াশীল। শিল্প-সৃজনের প্রাক্কালে সমগ্র ব্যক্তিত্ব—ব্যক্তিত্বের অন্তরালবর্তী মানসিক প্রক্রিয়ার দ্বন্দ্ব, স্মৃতির অনুষঙ্গ, সমস্ত কিছুই হয় সুনিয়ন্ত্রিত।

সম্ভবত কোনো একজন ভাস্কর তাঁর সচেতন অভিজ্ঞতা থেকে কতকগুলি সূত্র দান কোরতে পারেন যেগুলি কিনা ভাস্কর্যের রূপরহস্য অনুধাবনে অংশত সাহায্য করে। এ প্রবন্ধ তার বেশী আর কিছু নয়। ভাস্কর্য সম্পর্কে সামগ্রিক অনুসন্ধান অথবা ভাস্কর হিসাবে হেনরী মূরের ক্রমবিবর্তন কিছুরই নিদর্শন নয় এ প্রবন্ধ। কখনো কখনো ভাস্কর্যের যে-সমস্ত সমস্যা সম্পর্কে মূর-কে রীতিমত ভাবতে হোয়েছে তার-ই কিছু ইঙ্গিত বিচ্ছুরিত হোয়েছে এখানে।

মূর লিখছেন : বস্তুর ত্রিমাত্রিক রহস্য অনুধাবনের প্রচেষ্টা বা ক্ষমতার উপরই নির্ভরশীল ভাস্কর্যের রসগ্রহণ। সেইজন্যেই হয়তো ভাস্কর্যকে বলা হোয়েছে শিল্প হিসাবে কঠিনতম, কেননা অন্যান্য শিল্পসমূহে কেবলমাত্র ফ্ল্যাট ফর্ম ও বস্তুর দুটিমাত্র আয়তন নিয়েই কাজ। বর্ণ-অন্ধ মানুষের চেয়ে ফর্ম-অন্ধ মানুষ সমধিক। শিশু সর্বাগ্রে দেখতে শিখে দুটি আয়তন-বিশিষ্ট বস্তুকে চিনতে পারে। দূরত্ব, গভীরতা বা বেধের ধারণা থাকে না। পরে তার নিজের নিরাপত্তা এবং ব্যবহারিক প্রয়োজনের জন্য তিনটি আয়তন বিশিষ্ট দূরত্ব বিচারের মোটামুটি ক্ষমতা অর্জন করে (কিছুটা স্পর্শের সাহায্যে)। ব্যবহারিক প্রয়োজনের সীমানা ছাড়িয়ে অনেক বয়স্ক মানুষেরই দৃষ্টি চলে না। গভীরতম আবেগে অথবা বুদ্ধিদীপ্ত প্রচেষ্টায় বস্তুকে তার যথাযথ স্বরূপে উপলব্ধি প্রভৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রেই শূন্য।

কোনো একজন ভাস্করের পক্ষে এইটেই হোচ্ছে করণীয়। তিনি সতত সচেষ্ট হবেন বস্তুকে আপন স্বরূপে ধ্যান কোরতে ও ব্যবহার কোরতে। তিনি সম্পূর্ণ কোনো অবয়বকে মাথার ভিতর ধারণ কোরে চিন্তা কোরবেন — আকৃতি তার যাই হোক না কেন। তিনি বা সেই ভাস্কর মানসচক্ষে দেখতে পাবেন জটিল ফর্ম বা রূপকে বস্তুর চারিপাশ থেকে। এক পাশে যখন তিনি দৃষ্টি ফেলেন তখনো তাঁর অপর পাশ সম্পর্কে জ্ঞান সম-পরিমাণ।

ভাস্কর্যের সচেতন রূপ-রসিককে অবশ্যই ফর্ম-কে ফর্ম হিসাবে অনুভব কোরতে হবে—কোনো স্মৃতির বিবরণ হিসাবে নয়। উদাহরণতঃ ধরা যাক একটি ডিম। ডিমকে অনুভব কোরতে হবে কেবলমাত্র ঘনবস্তু হিসাবেই। খাদ্য হিসাবে তার বৈশিষ্ট্য অথবা ভবিষ্যতে পাখিতে পরিণত হবার সাহিত্যিক ভাব-কল্পনা বিযুক্ত কোরে। অনুরূপভাবে সমস্ত ঘনবস্তুকে অনুভব করা যেতে পারে—যথা একখানা বাদাম, একটি কুল, কোনো

গাছের গুঁড়ি, একটি পাখি, একখণ্ড হাড়, পাহাড়ের চূড়ো, কিডনি, একটি নাশপাতি। উদাহরণ আরো বাড়ান যেতে পারে। এইভাবে তিনি ক্রমে জটিলতম ফর্মের রূপরহস্য ও অনেকগুলি জটিল ফর্মের সৌষম্যে সৃষ্ট এক ফর্মের রস গ্রহণে সক্ষম হবেন।

এরপর মূর রুমানীয়া তথা প্রতীচীর স্বনামধন্য ভাস্কর কনস্টান্টিন ব্রাঁকুসীর প্রসঙ্গ উত্থাপন কোরে লিখছেন :

ব্রাঁকুসীর বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল অতিরিক্ত ভারটুকু থেকে ভাস্কর্যকে মুক্ত কোরে আমাদের ফর্ম-সচেতন করা। এর জন্য তাঁকে দিতে হোয়েছে সরল প্রত্যক্ষ-ঘনিষ্ট রূপের প্রতি পুরো মনোযোগ। ব্রাঁকুসীর কাজের নিজস্ব মূল্য ছাড়াও সমসাময়িক ভাস্কর্যের ক্রম-বিকাশের ঐতিহাসিক প্রেক্ষণীতে উক্ত ভাস্কর্য কর্ম-গুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

মূর অতঃপর আধুনিক ভাস্কর্যের ধারার উল্লেখ করছেন : সাম্প্রতিককালের ভাস্কর্যকে একটিমাত্র সামগ্রস্যপূর্ণ স্থিতিশীল ফর্ম-এর মধ্যে আবদ্ধ রাখার প্রয়োজন নেই। নানারূপ বিষম ফর্ম ও আকৃতিকে, আকারের অংশকে সামগ্রিক গঠনসূত্রে ঐক্যবদ্ধ করবার কথাই ভাববো আমরা।

মানবিক আকৃতির প্রতি আমার অন্তরে গভীরতম আগ্রহ থাকলেও প্রাকৃতিক রূপাঙ্গগুলির প্রতিও আগ্রহ কম নয়। কখনো কখনো আমি বছরের পর বছর সমুদ্রতীরে একই জায়গায় ঘুরে বেড়িয়েছি। প্রতিদিন নূতন নূতন আকারবিশিষ্ট নুড়ি আকর্ষণ কোরেছে দৃষ্টি। লক্ষ লক্ষ নুড়ির সামনে দিয়ে চলতে চলতে সেইগুলির প্রতি কেবলমাত্র দৃষ্টিনিবদ্ধ হোয়েছিল আমার যেগুলির আকার ছিল তৎকালীন আকার-চেতনার অনুবর্তী।

কতকগুলি সার্বজনীন আকৃতি আছে যেগুলির প্রতি অবচেতন ভাবে সকলেই আকর্ষণ অনুভব করে; যদি-না মনের সচেতন ক্রিয়া সেই চেতনাকে আচ্ছন্ন বা অবদমিত না কোরে থাকে।

যখন সোজাসুজি শক্ত, ভঙ্গুর কোনো বস্তু নিয়ে কাজ আরম্ভ করা যায়—পূর্ব অভিজ্ঞতার অভাব ও উক্ত বস্তুর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা থাকায় পাছে বস্তুটির অপব্যবহার হয় সেদিকে দৃষ্টি থাকে। ফলে, ভাস্কর্য কর্মটি দুর্বল হোয়ে পড়ে শেষ পর্যন্ত।

একখণ্ড পাথরের মধ্যে প্রথম গর্তটিকে বলা চলে প্রকাশ বা উদ্ঘাটন। উক্ত গর্ত পাথরের এক প্রান্তের সঙ্গে অপর প্রান্তের যোগ ঘটিয়ে বস্তুর তৃতীয় আয়তনকে আরোই বাস্তবনিষ্ঠ করে। গর্তের রহস্য পাহাড় ও উঁচু জায়গায় অবস্থিত গুহা দেখলেই যেন আমরা বুঝতে পারি কিছুটা।

মূল্যবান পাথরের অনেকগুলি খণ্ড আমার স্টুডিও-র মধ্যে অনেক অনেকদিন অব্যবহার্য অবস্থায় পড়ে থাকে। কেননা আমার তদানীন্তন রূপকল্পনার পক্ষে সেগুলি যথাযথ নয়।

দেখা যায়, কোনো কোনো ভাস্কর্যকর্ম বাস্তব পরিমাপের চেয়ে অনেক বড়ো হোয়েও অনুভূতির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও দীন। এর উল্টোটাও চোখে পড়ে। ফিট-ইঞ্চির পরিমাপে কমতি থাকলেও গাম্ভীর্য ও অনু-ভূতির ক্ষেত্রে সেটি বৃহৎ ও উদার। ফিট ও ইঞ্চিতে চলে না পরিমাপ, রূপকল্পনার দ্বারা যুক্ত হোয়েই মনুমেণ্টালিটি।

তথাপি একথা স্বীকার্য, ভাস্কর্যে বস্তুর বাস্তব-জগতের যথাযথ পরিমাপের অনুভূতিসাপেক্ষ আবেদন আছে। আমরা আমাদের নিজেদের পরিমাপের পরি-প্রেক্ষায় পরিমাপ-সচেতন। বেশীর ভাগ মানুষ সাধারণত পাঁচ থেকে ছ' ফিট দৈর্ঘ বিশিষ্ট। ছবির চেয়ে ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এই বাস্তবজগতের অনুরূপ পরিমাপ চেতনার ব্যাপারটি প্রাধান্য লাভ বিশেষ লক্ষণীয়।

নিজের বিষয় উল্লেখ কোরে হেনরী মূর জানাচ্ছেন যে, তিনি গ্রামের উদার পরিবেশে কাজ কোরতে বেশী আনন্দ পান। এক খণ্ড পাথর বা কাঠের গুঁড়িকে মুক্ত প্রাঙ্গণে দর্শনমাত্রে তাঁর মধ্যে জাগে উদ্দীপনা। মহান সৃষ্টি প্রেরণার হাতছানি যেন তাঁকে আহ্বান করে।

সুররিয়ালিস্ট ও অ্যাবস্ট্রাকশানিস্টদের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব তাঁর নিরর্থক মনে হয়। সমস্ত সংশিল্পের মধ্যেই পূর্বোক্ত দুটি ব্যাপার বর্তায় যেমন বর্তায় রোমান্টিক ও ক্লাসিক ভাবধারা। সংযম ও বিস্ময়, চেতনা ও অবচেতনা। শিল্পী ব্যক্তিত্বের দুটি প্রান্ত স্বীয় অংশগ্রহণে সচেষ্ট থাকে। যে-কোন এক প্রান্তের সক্রিয়তায় ছবি অথবা ভাস্কর্য মূর্ত হোয়ে উঠতে পারে। তাঁর নিজের অভিজ্ঞতা থেকে বোলেছেন : আমি কখনো কখনো কাগজ পেনসিল নিয়ে ড্রয়িং সুরু করি—কিন্তু ড্রয়িংটি কোন পূর্বনির্ধারিত রূপ-কল্পনা নয়—কয়েকটি রেখা ও আকার ফুটে উঠতে থাকে—অবশেষে এমন একটি ক্ষণ আসে যখন মনে হয় অগোচরে কোন রূপকল্পনা দানা বাঁধতে সুরু কোরেছে। এই সময়ই সংযম এসে সমস্ত রূপকল্পনাটি রূপায়ণের পথে সাহায্য করে। আবার কখনো কখনো সুসম্পূর্ণ রূপকল্পনা সামনে রেখেই কাজ সুরু হয়। রূপের সুসংগত সম্বন্ধ আবিষ্কারের সচেতন চেষ্টা চলে সারাক্ষণ।

মূর প্রবন্ধের শেষে কয়েকটি অতিশয় মূল্যবান কথা বোলেছেন : আমি পূর্বে আকার ও রূপ সম্বন্ধে যা বোলেছি তা থেকে মনে হোতে পারে যে এইগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ। এছাড়া আরো কিছু বেশী। আমি অত্যন্ত সজাগ যে আনুষঙ্গিক ও মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার-গুলিরও বিশেষ প্রভাব রয়েছে ভাস্কর্য নির্মিতির নেপথ্য লোকে। ফর্মের অর্থ ও তাৎপর্য নির্ভরশীল মানুষের আবহমানকালের ইতিহাসের অসংখ্য অনু-ষঙ্গ। যেমন গোল আকার—অভিব্যক্ত করে পূর্ণতা, উর্বরতা বা সমৃদ্ধি। তার কারণ হয়তো পৃথিবী, নারীর বক্ষদেশ, অধিকাংশ ফলই গোলাকার।

মানবিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলির রূপ ভাস্কর্যের মৌলিক প্রয়োজনের জন্য অপরিহার্য। উপরন্তু ভাস্কর্যকে দেয় প্রাণশক্তি।

আমি মানুষ ও পশুর মূর্তি রূপায়ণের সময় তাদের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে দিয়েছি প্রাধান্য।

আমার ভাস্কর্য ক্রমেই কম সাদৃশ্যমূলক হওয়ার ফলে অনেকের ধারণা—এটা অ্যাবস্ট্রাক্ট শিল্প। ওই সকল মতামতের মূল্য বিচার আপাতত স্থগিত রেখেই বলি, আমার ধারণা এইভাবে আমি মানুষের মনস্তা-ত্ত্বিক উপকরণকে যথাযথ ও গভীর ভাবে প্রত্যক্ষ সরলতায় প্রকাশ কোরতে পারবো।

ভাস্কর্য সম্পর্কে বক্তব্য

জিয়াকোমেত্তি

স্পেনের বিখ্যাত ভাস্কর জিয়াকোমেত্তি। ইংরাজীতে লিখিত তাঁর ভাস্কর্য সম্পর্কে প্রবন্ধের আংশিক অনুবাদ। অনুবাদ কোরেছেন : রাণা বসু।

একটি মাথা : জিয়াকোমেত্তি-কৃত ভাস্কর্য।

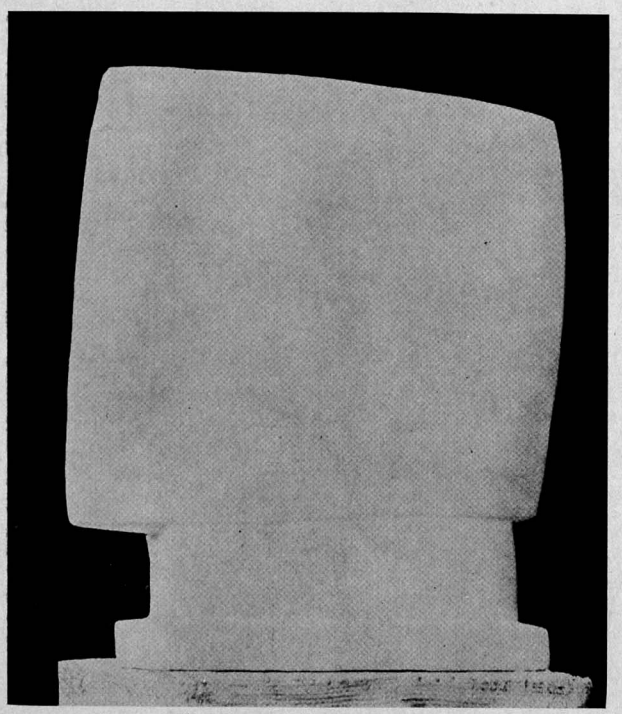

আমার অনুভূতিই আমার ভাস্কর্যে প্রকাশমান হয়েছি। আকাদেমির সংগে যুক্ত থাকাকালীন আমার জীবন ও সৃষ্টির মধ্যে এক অন্তর্দ্বন্দ্ব চলেছিল—একে অপরকে বাধা দিয়েছে—কী করে তার সমাধান হতে পারে তার কোনো পথ আমি তখন পাইনি। কোনো এক বাঁধাধরা সময়ে কোনো শরীরীকে আকার দান আমার কাছে সম্পূর্ণ মিথ্যে, বোকামী ছাড়া আর কিছু নয় বলে মনে হত। এইভাবে ভাস্কর জীবনের সূচনায় আমার বহু অমূল্য সময়ের অপচয় ঘটেছে।

একটি অবয়ব কোনো মনুষ্য নমুনার যে হুবহু কপি হবে এটা আমি মনে করি না। আমি মনে করি সৃষ্ট অবয়বটি আমার কল্পনায় কতখানি জীবন্ত এবং কার্যে পরিণত হয়েছে, অথবা আমি যে রূপ দেবো বলে স্থির করেছি তা কতটা যথাযথ হচ্ছে। এ ছাড়া শান্ত এবং উগ্রের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করাই প্রকৃত শিল্পের লক্ষণ। উনিশশো বত্রিশ থেকে উনিশশো চৌত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে এই ভাবনা নিয়েই আমার ভাস্কর্যগুলি সৃষ্টি করেছি। জীবনে যে অবয়বগুলি আমাকে আকৃষ্ট করেছে এবং যে 'আবস্ট্রাক্ট' ফর্ম-গুলি আমি চিন্তা করেছি সেগুলিই আমার ভাস্কর্যে সত্য হয়ে উঠেছে। আমি চাইতাম আমার কল্পনার যেন কোনো উদ্দীপনাই না হারায়—সব যেন আমার সৃষ্টির মধ্যে যথাযথ থাকে।

উনিশশো পঁয়ত্রিশ থেকে উনিশশো চল্লিশ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আমি মডেল সৃষ্টি করেছি। আমি যা চিন্তা করতুম সৃষ্টির মধ্যে তা কোথায়ও পরিবর্তন আনে নি। একটি মস্তিষ্ক যার কোনো 'ডায়মেন্‌শন' নেই তা আমার হাতে এক অজানা বস্তুর রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। দুবার আমি দুটি মস্তিষ্ক তৈরি করব বলে কাজ শুরু করি এবং অবশেষে সে দুটি সম্পূর্ণ করতে না পেরে একপাশে ফেলে রাখি। পূর্ণতা লাভের জন্যে আমি স্মৃতির সাহায্যে কাজে প্রবৃত্ত হই। ওই ক-বছর আমি প্রকৃতির বহু বিচিত্রতাকে রূপদানের চেষ্টা করি। স্মৃতির সাহায্যে শিল্প সৃষ্টি করতে গিয়ে আমি দেখেছি আমার ভাস্কর্যগুলি ক্রমশই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হচ্ছে।

একটি বৃহৎ অবয়ব আমার কাছে অসত্য এবং একটি ক্ষুদ্র অবয়ব আমার কাছে অসহনীয় বোধ হয়েছে। প্রায়শই তারা এতো ক্ষুদ্র হয়েছে যে আমার ছুরির একটিমাত্র আঘাতেই তারা সম্পূর্ণ ধূলিতে পরিণত হয়েছে। মস্তিষ্ক বা অবয়ব যতক্ষণ ক্ষুদ্র থাকে ততক্ষণই তারা সত্য—এটাই আমার মনে হয়।

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ খ্রীষ্টাব্দে আমার ভাবনার পরিবর্তন ঘটে। ওই সময় থেকে আমি বিরাট আকারের ভাস্কর্য নির্মাণে মনোনিবেশ করি। তখন থেকে আমার মনে জাগে একটি ভাস্কর্য দীর্ঘ এবং কৃশ হলে তবেই তার সাদৃশ্য বা মিল পাওয়া যায়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত আমি যতগুলি ভাস্কর্য রচনা করেছি সেগুলির ভেতর এই ভাবনাররই রূপ দর্শকজন দেখতে পাবেন।

প্রদর্শনী পরিক্রমা

বিশেষ প্রতিনিধি

শিল্পী সুচন্দ্রা রায়ের আলোকচিত্র।

শ্রীমতী সুচন্দ্রা রায়-এর একক প্রদর্শনী।

কোনো আর্ট স্কুল বা আর্ট কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত না হোয়েও যে কয়জন শিল্পী হিসাবে সম্মানলাভে সক্ষম হোয়েছেন তাঁদের মধ্যে শ্রীমতী সুচন্দ্রা রায়ের নাম বিশেষভাবে স্মর্তব্য। বাংলার দুই বিখ্যাত শিল্পী যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় (জে. পি. নামেই তিনি প্রসিদ্ধ) ও মাখন দত্তগুপ্ত—এঁদের তত্ত্বাবধানে কিছুকাল অনুশীলন কোরেছিলেন বাড়ীতে। এই দুজন শিল্পীর প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব শ্রীমতী রায়ের শিল্পীজীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রতিফলিত, তত্রাচ একথা বলা যায় যে, আপন সত্তার বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দেননি কখনো তিনি।

সমসাময়িককালে তাঁর ছবি কোলকাতার কতিপয় প্রদর্শনীতে দেখার সৌভাগ্য মিলেছে আমাদের। রচনার উন্নতমানের স্বীকৃতি হিসাবে স্বর্ণপদক ও প্রশংসাপত্র পেয়েছেন শ্রীমতী রায়। (যথা উনিশশো আটান্ন সালে ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটি পরিচালিত মহিলাদের শিল্প-প্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক-লাভ।) বর্তমান বছরের গোড়ার দিকে কোলকাতার আর্টিস্টিক হাউসে অনুষ্ঠিত হোয়েছিল

শিল্পী সুচন্দ্রা রায় অঙ্কিত : পঠনরতা।

সুচন্দ্রা রায়ের প্রথম একক প্রদর্শনী। তেলরঙ ও প্যাস্টেলের কাজ সহ মোট একান্নটি ছবি প্রদর্শিত হয়। তেলরঙই অধিকাংশ ছবির মাধ্যম। নিসর্গচিত্র, প্রতিকৃতি, পল্লীজীবন, শহুরে জীবন—বিভিন্ন বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি এঁকেছিলেন শিল্পী। প্রতিকৃতি বা পোট্রেট অঙ্কনে তাঁর সবিশেষ নৈপুণ্য পরিস্ফুট। নানাদেশের জনসাধারণের চরিত্রের যথাযথ রূপায়ণে মুগ্ধ হোতে হয়। 'লাল পোষাকী', 'ডিঙি'—শিল্পী সুচন্দ্রা রায়ের প্রতিভার পরিচায়ক।

শিল্পী শ্রীমতী রায়ের নিসর্গচিত্রগুলিতে হিমালয় পর্বত, মথুরা, বারাণসী, রাজস্থান প্রভৃতি স্থানের মাধুর্য পুষ্প মধ্যে বিন্যস্ত সৌরভের ন্যায় প্রচ্ছন্ন অথচ পরাক্রান্ত। ভ্রমণ করা যে শিল্পীর নেশা আর তাঁর রূপদৃষ্টি যে সতত সজাগ—উপরোক্ত ছবিগুলির দর্শকমাত্রেই তা স্বচ্ছভাবে উপলব্ধি কোরবেন।

তাঁর অধিকাংশ ছবিই উজ্জ্বল রঙে আঁকা। প্রথাগত শিল্পপন্থার অনুসরণেই তিনি হয়তো

ভালবাসার ভাষা—
শিল্পী সুচন্দ্রা রায় অঙ্কিত
একটি বিশিষ্ট চিত্র।

গ্রামের বধূ—শিল্পী সুচন্দ্রা রায় অঙ্কিত একটি চিত্রের প্রতিলিপি।

জনৈকা মহিলার
প্রতিকৃতি।
এঁকেছেন শিল্পী
সুচন্দ্রা রায়।

বা তৃপ্ত। 'আধুনিক'-পন্থী রচনার কয়েকটি নিদর্শন আমাদের মনে হোল, শিল্পী নতুনত্বের সন্ধানে প্রয়াসী।

তেলরঙে আঁকা 'শান্তিময় পল্লী', 'সৌন্দর্য', 'তন্ময়া', 'বিয়ের মিছিল' ও প্যাস্টেলে আঁকা 'বধূ', 'ধূমপায়ী' রচনাগুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিল্পী সুচন্দ্রার প্রদর্শনীতে যথেষ্ট দর্শক সমাগম হোয়েছিল তো বটেই, উপরন্তু কিছু ছবিও বিক্রয় হোয়েছিল যা যে-কোন শিল্পীর পক্ষেই—বর্তমান অর্থনৈতিক দুরাবস্থার যুগে অন্তত গর্বের ও আনন্দের ব্যাপার।

শ্রীমতী রায়ের পরবর্তী একক প্রদর্শনীর প্রত্যাশায় রইলাম। হয়তো তাঁর শিল্পী জীবনের নতুন কোন বাঁকের দেখা পাওয়া যাবে। সার্থক শিল্পী হিসাবে সুচন্দ্রা রায়ের পরিণতি আমাদের একান্ত কামা।

ফুলের স্টাডি।
এঁকেছেন শিল্পী সুচন্দ্রা রায়।

শিল্পী টুটু লাহিড়ী অঙ্কিত
একটি চিত্রের প্রতিলিপি।

নীচের ছবি—
দূরের গ্রাম : শিল্পী সুচন্দ্রা রায়।

গ্রামের মেয়ে জল তুলতে
চলেছে। সুচন্দ্রা রায় অঙ্কিত
একটি চিত্রের প্রতিলিপি।

শ্রীমতী অরুন্ধতী রায়চৌধুরীর একক প্রদর্শনী।

সাতাশখানি তৈলচিত্র ও বাইশখানি রেখাচিত্র প্রদর্শিত হোয়েছিল শ্রীমতী অরুন্ধতী রায়চৌধুরীর এবারের প্রদর্শনীতে। বলা বাহুল্য এটি একক প্রদর্শনী। স্থান : আর্টিষ্ট্রি হাউস। মানুষের চিরন্তন ব্যথা বেদনাকে রঙে রেখায় ফুটিয়ে তোলার প্রয়াসী হোয়েছিলেন শ্রীমতী চৌধুরী। শিল্পীর প্রকরণ পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর পরিণয়ে সার্থক অনেকগুলি ছবি শিল্প-রসিকজনের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হোয়েছিল।

'মাতৃত্ব', 'শূন্য মুহূর্ত', 'বাৎসল্য', 'স্বর্গীয় ছায়া' নামক রচনাগুলি অনেকেরই ভালো লেগেছিল আমাদের মতো। সব কয়টি রেখাচিত্র না ওতরালেও (কোন কোনটিতে রীতিমত শিক্ষানবিশীর ছাপ প্রকট) ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জীবনের রূপায়ণে শিল্পী যে নিষ্ঠা ও সততার পরিচয় দিয়েছেন তা প্রশংসনীয়।

আশা করি, আগামী প্রদর্শনীতে শ্রীমতী অরুন্ধতী রায়চৌধুরী শিল্পী হিসাবে মহত্তর পরিণতির স্বাক্ষর দেখতে পার।

শ্রীমতী নীপা রায়চৌধুরীর একক প্রদর্শনী।

নীপা রায়চৌধুরীর একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হোয়েছিল আর্টিস্টিক হাউসে। মহিলাদের মধ্যে যাঁরা শিল্পী হিসাবে সাধারণ্যে পরিচিতি লাভ ছাড়াও রসিকজনের নিকট থেকে সমাদর পেয়েছেন তাঁদের একজন হোচ্ছেন নীপা রায়চৌধুরী।

শিল্পী হিসাবে তিনি প্রথানুসারী। এঁর ছবি সর্বজনকে দিয়েছে তৃপ্তি। সুন্দর সৃষ্টি-শীল মনের পরিচায়ক সেগুলি। তুচ্ছতম বস্তুকে দিয়েছে রূপাতীত রহস্য। রঙের ব্যবহারে শিল্পী যে নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন তা অনেক শিল্পীর ঈর্ষার বিষয়। বাংলার সাম্প্রতিক শিল্পজগতে তথাকথিত 'আধুনিকতা'র নামে যে যথেচ্ছাচারিতার প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে

শিল্পী নীপা রায়চৌধুরী অঙ্কিত চিত্রের প্রতিলিপি।

শিল্পী নীপা রায় চৌধুরী অঙ্কিত চিত্রটির নাম : মাতা ও পুত্র।

শিল্পী নীপা রায়চৌধুরী অঙ্কিত চিত্র : বাজার।

শিল্পী টুটু লাহিড়ী অঙ্কিত
আত্ম-প্রতিকৃতি।

নীপা রায়চৌধুরীর রচনাগুলি ব্যতিক্রম বোলেই মনে হয় আমাদের। প্রদর্শনী দেখে বেরিয়ে আসার পরও আমাদের মন অনেকক্ষণ পর্যন্ত কয়েকটি আনন্দিত মুহূর্তের স্বাদ ভুলতে পারে না।

শ্রীমতী চৌধুরীর আরো সুপরিণত শিল্পপ্রতিভার নিদর্শন দেখবার আশা জানিয়ে এ-প্রসঙ্গে ছেদ টানা যাক্।

শ্রীমতী টুটু লাহিড়ীর একক প্রদর্শনী।

শিল্পী টুটু লাহিড়ীর প্রথম একক প্রদর্শনীতে দেখা গেল কিছু ড্রয়িং ও তেলরঙের কাজ। ইনি মূলত বাস্তবধর্মী শিল্পী হোলেও এঁর অনেকগুলি ছবিই ভাব-ব্যঞ্জনায় রঙে-রেখায় সুন্দর শিল্পরূপ পেয়েছে। উজ্জ্বল প্রাণের প্রকাশে ব্যাপ্ত এঁর চিত্র-সম্ভার।

মনে পড়ছে শ্রীমতী লাহিড়ীর 'জীবন' নামক একটি চিত্র। দুর্দমনীয় শক্তি নিয়ে যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট নারী আপনাকে চাইছে প্রতিষ্ঠিত কোরতে।

'শিলচর', 'উনিশে মে, উনিশশো একষট্টি', 'অন্ধকার ঘর', 'অনামনী' অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় বহন কোরছে শিল্পীর। 'নীল মরুদ্যান'-এ অ্যাবস্ট্রাক্ট বা বস্তু-অবচ্ছিন্ন চিত্র-রচনার প্রচেষ্টা ততটা সার্থক হোয়ে উঠতে পেরেছে বোলে মনে হয় না। শ্রীমতী লাহিড়ী আপন সার্থকতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হোন—এই কামনা জানাই।

শ্রীমতী মাধুরী গুপ্ত।

দিলীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত 'স্টুডিও'-র সভ্য শ্রীমতী মাধুরী গুপ্ত। আর্টিস্টিক্ হাউসে এঁর প্রথম একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। মোট পঞ্চাশখানি ছবি দেখতে পাওয়া গেল এ-প্রদর্শনীতে।

'অভ্যন্তর', 'গর্বিতা রমণী', 'আম্রকুঞ্জ', 'মন্দির' চিত্রসমূহ শিল্পীর শক্তির পরিচয়-বহ। 'স্টুডিও' গোষ্ঠী-র ছাপ তাঁর চিত্র-কর্মে পাওয়া গেলেও শ্রীমতী গুপ্তের স্বকীয়তা অনস্বীকার্য। তিনি গভর্ণমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্রাফটের প্রাক্তন ছাত্রী।

আশা করি ভবিষ্যতে শ্রীমতী মাধুরী গুপ্ত আরো সুপরিণত বিশিষ্টতার সম্মুখিন হবেন।

শিল্পী টুটু লাহিড়ী কর্তৃক অঙ্কিত একটি বিশিষ্ট চিত্রের প্রতিলিপি।

ব্রাঁকুসী তাঁর স্বীয় স্টুডিওর পরিমণ্ডলে।

ভাস্করের স্বীকৃতি।

পঞ্চাশ বছরের চেয়ে বেশী ছিলেন তিনি পারীতে। পঞ্চাশ বছরের অধিককাল পারীর শিল্প-জগতের কাছ থেকে পাননি তিনি স্বল্পতম স্বীকৃতি।

মঁপারনসে—দরিদ্র শিল্পীদের বাসকেন্দ্র বলা চলে যেটাকে—সেই রাস্তার এক প্রান্তে ইমপাসে রন্‌সিন-এ ছিল তাঁর আবাস-স্থল। চারিদিকে ভাস্কর্যের নানা উপকরণ পরিবৃত হোয়ে কাটতো তাঁর দিন। কখনো তাঁকে দেখা যেত নতুন কোনো শিল্প-কর্মে আত্মমগ্ন। কখনো বা উদাসীন ব্যর্থ দৃষ্টি শূন্যের দিকে বিলীন। বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হোয়েছে আর তাঁর ঘর পূর্ণ হোয়েছে রূপের অসামান্য সব সৃষ্টিতে। মুখ-মণ্ডলে দাড়ি হোয়েছে দীর্ঘতর। পরিধেয় পোষাক হোয়েছে মলিনতর।

বেশীর ভাগ সময় ক্রেতারা আসতো দূর দূরান্তের দেশ থেকে। উনিশশো কুড়ি সালে তিনি সাঁলো দ্য ইন্‌ডিপেনডানটস-এর জন্য যে ভাস্কর্য রচনাগুলি পাঠান—সেগুলি মনোনয়ন লাভে সক্ষম হয়নি। আরোই আশ্চর্য, যত বছর পারীতে কাজ কোরেছিলেন ভাস্কর, তিনটি মাত্র ভাস্কর্য ন্যাশনাল মিউজিয়ম অব আর্ট বা জাতীয় শিল্প সংগ্রহশালা কর্তৃক ক্রীত হয়।

ভাস্করকে খুব কম সময়ই দেখা যেত বাইরে। সামাজিক মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ছিল তাঁর অত্যন্ত কম। তাই যখন সমগ্র শহরের লোক যুদ্ধের অনিবার্য প্রয়োজনে স্টুডিওটি দখল কোরে হাসপাতালে পরিণত কোরতে দৃঢ় সংকল্প সেই বৃদ্ধ নিরস্ত কোরলেন তাদের তখন এই বোলে, যে তাঁর ভাস্কর্য কর্মের সংগ্রহ সর্তহীন ভাবে দান কোরবেন ন্যাশনাল মিউজিয়ম অব মডার্ন আর্ট-এ। ভাস্করের একান্ত নিজস্ব জগৎ ছিল স্টুডিও কক্ষটি। এতো বড়ো মূল্যদানেও তিনি হোলেন না পশ্চাদপৎ। শহরের লোকেরা ভাস্কররকে রেহাই দিল।

গ্রোনজালেস নির্মিত ভাস্কর্যের একটি নিদর্শন।

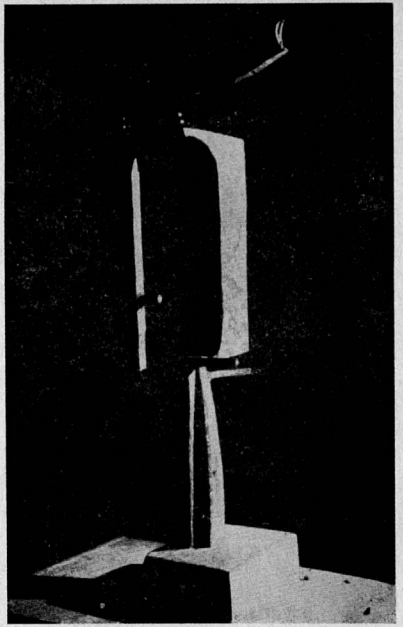

খবরাখবর

নিজস্ব সংবাদদাতা

হাসপাতালের পরিকল্পনা হোল পরিত্যক্ত।

একদা সেই শেষের দিনটি উপস্থিত হোল যেদিন চিকিৎসকরা একবাক্যে ঘোষণা কোরলেন—মৃত্যু অবধারিত—যদি না তিনি স্টুডিও কক্ষ ছেড়ে আরোগ্য-লাভের জন্য হাসপাতালে না যান অবিলম্বে। চিকিৎসক-দের আদেশ অমান্য কোরলেন তো বটেই, স্মিত কণ্ঠে পার্শ্বস্থ বন্ধুকে বোললেন : আমি এইখানে, এই স্টুডিওতেই ঈশ্বরের জন্য অপেক্ষা কোরবো।

উনিশশো সাতান্ন সাল। বিরাশি বছর বয়স্ক ভাস্কর পরলোকে গমন কোরলেন।

মৃত্যুর পর পাওয়া যায় একটি উইল। উইলটি বিস্ময়কর! তাতে লেখা আছে মিউজিয়ম অব মডার্ন আর্টকে প্রদত্ত তাঁর ভাস্কর্য রচনাগুলিকে ভাস্করের পুরনো স্টুডিও-র (অর্থাৎ ইমপাসে রন্‌সিন-এ অবস্থিত স্টুডিওর) যথাযথ পরিবেশে সংস্থাপনা কোরে যেন সাধারণে প্রদর্শিত হয়।

গত বছরের শেষের দিকে উপরোক্ত উইলের সর্ত পালন সম্ভব হোয়েছে। 'রুণ্ড করা নিগ্রো রমণী' 'চুম্বন', 'রাজার রাজা'—সমস্ত শ্রেষ্ঠ ভাস্কর্য কর্মগুলি দেখা গেল তাদের আপন রূপমাধুর্যে। প্রতিদিন রাত্রে ঘুমোতে যাবার আগে, এই সমস্ত প্রাণাধিক প্রিয় ভাস্কর্য সৃষ্টিগুলিকে ভাস্কর চুম্বন কোরতেন, তারপর কাপড় দিয়ে মুছে ঢাকা দিয়ে রাখতেন।

আজ আর অনুভব করা সম্ভবপর কি সেদিনকার নিদারুণ অবহেলার যন্ত্রণা? দেশে দেশে শিল্পরসজ্ঞরা বিস্মিত নয়নে তাকিয়ে থাকে তাঁর অপূর্ব সৃষ্টিসম্ভারের পানে। ভাস্কর্যকলার ইতিহাসে নব দিগন্ত উন্মোচন-কারী হিসাবে প্রণাম জানায় তারা।

এই ভাস্করের নাম কনস্টাণ্টিন ব্রাঁকুসী। রুমানীয়ায় জন্ম হয়েছিল তাঁর।

গোনজালেস-কৃত আত্ম-প্রতিকৃতি।

'মণ্ট্সেরাটে'র মাথা ও মুখোস।
স্রষ্টা গোনজালেস।

মাতৃত্ব : গোনজালেস রূপায়িত অভিনব ভাস্কর্য।

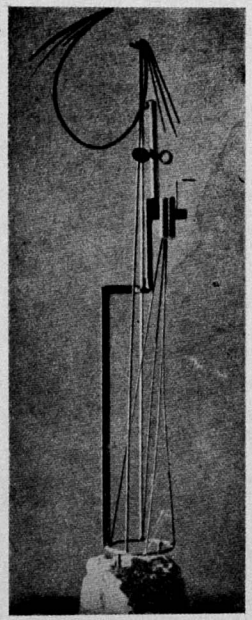

স্প্যানিশ ভাস্কর গোনজালেস।

সম্প্রতি মানহাটনের শালেট গ্যালারীতে স্পেনের ভাস্কর জুলিও গোনজালেসের রেখাচিত্র, মুখোস, ভাস্কর্য সমন্বিত একটি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হোয়ে গেল। গোনজালেসের সৃষ্টিগুলির নূতনত্ব স্বীকৃত হোতে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হোয়েছে।

আঠারশো ছিয়াত্তর সালে বার্সিলোনায় জন্ম হোয়েছিল শিল্পীর। যৌবনে বাবার আতেলিয়রে ভাই জনের সঙ্গে স্বর্ণকার হিসাবে এসেছিলেন পারীতে। বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী পাবলো পিকাসো ছিলেন তাঁর আশৈশব বন্ধু।

পঞ্চাশ বছর উত্তীর্ণ হোল গোনজালেসের। জীবনের অর্দ্ধেকের চেয়ে বেশী কেটে গেছে সমতল মসৃণতায়—পাওয়া যায়নি জীবনের নতুনতর কোন অর্থ। এই সময় লোহা, পিটিয়ে ভাস্কর্য নির্মাণের পরিকল্পনা এলো তাঁর মাথায়। প্রথম যুগে চিত্রাঙ্কন চর্চা কোরে থাকলেও আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসাবে ভাস্কর্যই হোল তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। সমস্ত শক্তি নিয়োগ কোরলেন এইদিকে। পাবলো পিকাসো ও জুলিও গোনজালেস যৌথভাবে কয়েকটি কাজ সাফল্যের সঙ্গে সম্পূর্ণ করেন। ফর্মের মুক্তি-সাধনের ব্রত ছিল দুজনেরই। পরবর্তীকালে নির্মিত অ্যাবস্ট্রাক্ট ভাস্কর্যগুলিতে খুঁজে পাওয়া যায় স্প্যানিশ রক্তের লক্ষণগুলি। স্পেনদেশীয় প্রতীক ব্যবহারে গোনজালেসের ছিল অপ্রতিরোধ্য আকর্ষণ। ফ্রাঙ্কো এবং যুদ্ধের অত্যাচারের নিদারুণ ভয়াবহতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ স্বরূপ 'মণ্টসেরাটে'র মূর্তি গড়েন তিনি। এই মূর্তিটির বিভিন্ন ধরণের রূপায়ণ দেখা যায়। এক ধরণের রূপায়ণের প্রতিলিপি সুন্দরম্-এর প্রতীচ্যের ভাস্কর্য, ১ম খণ্ডে মুদ্রিত হোয়েছে। 'ডন কুইকজোট' নামক মূর্তিটিও বিশেষ বিখ্যাত।

লোহার পাত পিটিয়ে ও ঢালাই কোরে যে মূর্তি গড়ার পদ্ধতি তার প্রথম যুগের পথিকৃত ছিলেন গোনজালেস।

মানহাটনের গ্যালারীতে প্রদর্শনীটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবার পর উপরোক্ত শিল্প-সৃষ্টিগুলি আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিভিন্ন স্থানে প্রদর্শিত হবে। উনিশশো তেষট্টি সাল পর্যন্ত এর সময়-সীমা। জগতে প্রতিটি স্থানের ভাস্করর। এই প্রদর্শনী দেখার পর গোনজালেসের উদ্দেশ্যে পাঠাবে তাদের আন্তরিক অভিনন্দন। কেননা তারা সকলেই ভাস্কর্যে নতুন পথের প্রথম পথিকৃতের কাছে বিশেষভাবে ঋণী।

এপ্স্টাইন : সাম্প্রতিক প্রদর্শনী।

কয়েকমাস পূর্বে লণ্ডনের টেট গ্যালারীতে বিখ্যাত ভাস্কর এপ্স্টাইন-এর ভাস্কর্য-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হোয়েছিল। কোনো কোনো শিল্প রসিক বোলেছেন তাঁর ভাস্কর্যে ডাচ্ শিল্পীর মানসিকতা ফুটে উঠেছে। স্বনামধন্য সাহিত্যিক অস্কার ওয়াইল্ডের প্রতিকৃতিতে

গোনজালেস রূপায়িত
'ডন কুইক্জোট'।

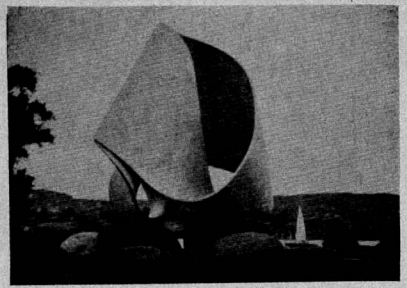

স্পেনের ভাস্কর
ম্যাক্স বিল-কৃত
একটি তাৎপর্যপূর্ণ
ভাস্কর্যের প্রতিলিপি।

লক্ষ্য করা গেছে অ্যাসীরিয় পদ্ধতির পরিমার্জিত অবতারণা। জওহরলাল ও রবীন্দ্রনাথের মূর্তি দুটি প্রসঙ্গত উল্লেখ্য। কল্পনা-প্রবণতাকে যখনই এপ্স্টাইন মতবাদের সূত্রে গ্রথিত কোরতে চেয়েছেন তখনই তিনি কিছুটা ব্যর্থ হোয়েছেন ছন্দমুক্তির ব্যাপারে। এই মোহ থেকে মুক্ত তাঁর শিল্পকর্মগুলি যথার্থ শক্তিশালী।

একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

যাঁরা আধুনিক চিত্র, ভাস্কর্য-এর বুদ্ধি গ্রাহ্য ব্যাখ্যা ছাড়াও আরো কিছু খুঁজতে চান সেখান থেকে তাঁদের পক্ষে কিছুদিন পূর্বে প্রকাশিত বিখ্যাত কলা-সমালোচক হার্বার্ট রীডের এই গ্রন্থ বিশেষ আদরণীয় হবে। গ্রন্থের নাম : দি ফর্মস অব থিংস আন্নোন।

শিল্পের মূল্য বিচারে বাস্তবজীবনের প্রতিফলন বা সামাজিক দায়-দায়িত্ব-এর প্রশ্ন গৌণ। শিল্প-রচনাটি আমাদের বোধের ক্ষেত্র প্রসারিত কোরতে পেরেছে কিনা সেই কথাই বিবেচ্য। বুদ্ধি ও বিচারলব্ধ জ্ঞানের বাইরে নতুন এক জগতের আস্বাদন পাই আমরা। তাই বোলে নিয়ম শৃঙ্খলাহীন নয় সে জগৎ। আর্টের নিজস্ব ভাষা তো রয়েছেই, রয়েছে প্রতীক। 'ইনটুইশনে'র কথা বোলেছেন শ্রদ্ধেয় রীড। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ভাস্কর হেনরী মূরের রচনার উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি দেখাবার চেষ্টা কোরেছেন—মূরের ভাস্কর্যকর্ম বুদ্ধি সঞ্জাত নয়। তাঁর শিল্প-প্রেরণার উৎসকে বলা যায় এক অদৃশ্য সত্তা। এই অদৃশ্য সত্তার নামই বোধকরি 'জীবনদেবতা' আখ্যা দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

পশ্চিম জার্মানীতে ভাস্কর।

রিচার্ড শাইবে ও রেনে সিন্টেনস দুজনেই জার্মানীর বিখ্যাত ভাস্কর। প্রথম জনের ক্লাসিকাল বা চিরায়ত শিল্পরীতি, দ্বিতীয় জনের জীবজন্তুর অভিনব রূপায়ণ বার্লিনের অধিবাসীদের প্রভূত আনন্দ দান কোরেছে তাঁদের সাম্প্রতিক ভাস্কর্য প্রদর্শনীর মাধ্যমে। পশ্চিম জার্মানীর শিল্প-কলার বাধা-বন্ধনহীন পরিবেশে এই দুজন ভাস্কর হয়তো-বা মুক্তির আস্বাদন পুলোকিত।

উপরোক্ত ভাস্করদ্বয়ের মতোই মর্ডানিষ্ট চিত্রকর বোলে পরিচিত হফার, রটলাফ্, পেকস্তেইন বার্লিনে কাজ কোরছেন আপন আপন স্টুডিও-র নিভৃত পরিমণ্ডলে। এঁরা পূর্বে পূর্ব জার্মানীর অধিবাসী ছিলেন। পূর্ব জার্মানীর অধিবাসী ছিলেন আরো কোন কোন চিত্রকর ও ভাস্করের পশ্চিম জার্মানীতে অধিষ্ঠানের খবর পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা মারফৎ। এর কারণ হয়তো চিত্রশিল্পী, ভাস্কররা যে সমস্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা রূপের অফুরন্ত আবিষ্কারে নিজেদের নিয়োজিত ও সার্থক কোরতে চান তা গণতান্ত্রিক জার্মানীর শিল্পদৃষ্টিকোণের অনুমোদিত নয়।

AN ENGLISH QUARTERLY

The Organ of Indian Art and Artists

Published

UNDER THE MANAGEMENT OF 'SUNDARAM'

- **Contributions from eminent artists and art critics.**
- **Innumerable multi-coloured illustrations.**
- **Printed on the best quality of imported art paper.**

DATE OF PUBLICATION WILL BE ANNOUNCED SHORTLY.

Office :

6A, Satchidananda Chambers, 7, Chowringhee Road,
CALCUTTA-13.

Telephone : 23-9777

EAST BENGAL ENGINEERING WORKS

Estd. 1908

SHIPBUILDERS, MARINE REPAIRERS, STRUCTURAL
AND GENERAL ENGINEERS

2, RUSTOMJI PARSEE ROAD,
CALCUTTA - 2

Telephone : { 56-2674
56-3473

Managing Agents :

RAJA SREENATH ROY & BROTHERS PRIVATE LTD.

Head Office :

87, SOVABAZAR STREET,
CALCUTTA - 5

সুন্দরম্ সঙ্কলন গ্রন্থ। সুভো ঠাকুর কর্তৃক ৬-এ সচ্চিদানন্দ চেম্বার্স, ৭, চৌরঙ্গী রোড, কোলকাতা-১৩ থেকে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। লালচাঁদ রায় এণ্ড কোং, ৭/১ নং গ্রাণ্ট লেন, কোলকাতা-১২ কর্তৃক মুদ্রিত।
সম্পাদকীয় দপ্তরের টেলিফোন : ২৩-৯৭৭৭